সম্পাদনা আশিস সান্যাল

ঋতুরাজ জওহরলাল

ঋতুরাজ জওহরলাল

সম্পাদনা

আশিস সান্যাল

মডেল পাবলিশিং হাউস

৩ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলকাতা-৭৩

Rituraj Jawaharlal [Jawaharlal : The King of Seasons]
Edited by : **Ashis Sanyal**

প্রথম প্রকাশ আগরতলা বইমেলা ১৯৮৯

[First March 1989]

প্রচ্ছদ, স্কেচ ও শিল্প-নির্দেশনা সুবোধ দাশগুপ্ত

মুদ্রণ
স্বর্ণলতা ঘোষ
ঘোষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৫৭/২ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

দাম : কুড়ি টাকা মাত্র

জওহরলালের সবচেয়ে প্রিয় কবিতা

শীতসন্ধ্যায় বনের কিনারে থেমে

রবার্ট ফ্রস্ট

মনে হয় জানি, জানি এ বনানী কার।
হতে পারে তার গাঁয়েতেই আস্তানা ;
সে তো দেখল না আমি যে দেখছি তার
বনে আর বনে ছেয়েছে হিমতুষার।

ছোট্ট ঘোড়াটা ভাবে এটা কী-ব্যাপার
গোলাঘর ছাড়া দাঁড়ানো কী-দরকার
হিমাদ্র হ্রদ আর বনানীর মাঝে
এ-সাঁঝেই যত আঁধার বছরকার।

নির্ঘাৎ কোনো গল্‌তি হয়েছে ভেবে
ঘন্টিগুলোকে কাঁপায় সে কেঁপে-কেঁপে
ঝিরিঝিরি হাওয়া পাৎলা বরফ কুচি
ছড় টেনে যায় আরেক স্বরক্ষেপে।

বনানী গভীর শ্যামসুন্দর নাকি,
তবু তো কথায় দিতে পারব না ফাঁকি,
ঘুমোবার আগে আ-যোজন পথ বাকি,
ঘুমোবার আগে আ-যোজন পথ বাকি।

[অনুবাদ : অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত]

এই কবিতাটি ছিলো জওহরলালের সবচেয়ে প্রিয়। ১৯৬৪ সালের ২৭মে মৃত্যুকালে তাঁর বিছানার পাশে খোলা ছিলো ফ্রস্টের এই কবিতাটি।

প্রকাশকের নিবেদন

বর্তমান পৃথিবীর এক আশ্চর্য ব্যক্তিত্ব জওহরলাল নেহরু। শতবর্ষ পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তিনি। স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্নিগর্ভ ঐতিহাসিক পটভূমিতে যাঁর কর্মজীবনের সূচনা, তিনিই জীবনের দুর্গম পথ-পরিক্রমায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন জাতির কর্ণধারের ভূমিকায়। জনপ্রিয় দেশপ্রেমিক ও দেশসেবক এই মানুষটি ছিলেন সমস্ত রকম ক্ষুদ্রতা থেকে অনেক দূরে। ধর্মভেদ বা জাতিভেদ তাঁকে স্পর্শ করতে পারে নি। বিজ্ঞানসম্মত মানসিকতা তাঁর চেতনাকে করেছিলো স্বচ্ছ। স্বভাবে তিনি ছিলেন কবি ও দার্শনিক। তাঁর জীবন-দর্শনের মর্মমূলে ছিলো উপনিষদের প্রাজ্ঞ অনুভব। আন্তর্জাতিকতা ছিলো তাঁর সহজাত। তিনি ছিলেন বিশ্বপ্রেমিক।

বর্তমান সংকলনটি এই মহান ব্যক্তিত্বের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি। বিভিন্ন সময়ে কবিরা যে-সব কবিতা রচনা করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন, তার থেকে কিছু চয়ন করে এই সংকলনে প্রকাশ করা হলো। একালের তরুণ কবিদের রচনায় জওহরলালের ব্যক্তিত্ব কি রকম প্রতিভাত হয়েছে, তার নিদর্শন হিসেবে তরুণতম কবিদের কিছু রচনাও এতে সংকলিত হলো। তাছাড়া কয়েকজন ভারতীয় কবির কবিতা অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় সংকলনটির মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে।

এই রকম একটি সংকলন সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে পারার জন্য সম্পাদকের কাছে আমি চির কৃতজ্ঞ। প্রচ্ছদ এঁকে দিয়েছেন সুবোধ দাশগুপ্ত। তাঁর কাছেও প্রকাশ করছি আমার কৃতজ্ঞতা। প্রেস, বাইণ্ডার এবং সংকলনের সঙ্গে যুক্ত সকলকে এই সুযোগে জানাই কৃতজ্ঞতা। সবশেষে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি তাঁদের কাছে, যাঁরা এই সংকলনে কবিতা প্রকাশের অনুমতি দিয়ে সাহায্য করেছেন।

বিনীত—

জয়দেব ঘোষ

প্রাক্ কথন

ভারতবর্ষের ইতিহাসে জওহরলাল নেহরু একটি আশ্চর্য নাম। মানব-প্রেম, জীবন-জিজ্ঞাসা ও বিশ্ববীক্ষা তাঁকে বর্তমান বিশ্বে এক স্বতন্ত্র মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। বুদ্ধিদীপ্ত বিজ্ঞান-চেতনা তাঁর ব্যক্তিত্বকে করেছে উজ্জ্বল।

ভারতীয় সমাজ-মানসে যখন নেহরুর আবির্ভাব, তখন সে-সমাজ ছিলো যুগান্তের ঘূর্ণাবর্তে ভয়ঙ্কর মাত্রায় চঞ্চল। জওহরলাল প্রথমেই আত্মিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন তার সঙ্গে। নতুন কালের চৈতন্য প্রবাহে সংযোগ করেছিলেন নতুন মাত্রা। তাঁর কর্মে ও মননে সংযুক্ত হয়েছিলো ভারতবর্ষের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ।

ভারত-ইতিহাসের তিনি হয়ে উঠেছিলেন এক প্রাজ্ঞ দ্রষ্টা। স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিয়েই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন: 'চীন আর ভারত ছাড়া আর কোথাও সভ্যতার একটা প্রকৃত অবিচ্ছিন্নতা দেখা যায় নি। সমস্ত পরিবর্তন, যুদ্ধ-বিগ্রহ, আক্রমণ সত্ত্বেও এই দুটি দেশেই প্রাচীন সংস্কৃতির সূত্র একটানা চলেছে। একথা ঠিক যে, দুটি দেশই তাদের অতীত গৌরব থেকে অনেক নেমে গেছে। আর অতীতের সেই সংস্কৃতি সুদীর্ঘ যুগ-যুগান্তরের পুঞ্জীভূত ধুলোয় আবর্জনায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। কিন্তু তবু তারা টিকে আছে—আর ভারতের সেই প্রাচীন সভ্যতাই আজকের ভারতীয় জীবনধারার ঐক্যের স্বরূপ।'

ইতিহাসের এই বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যায় তিনি অনুভব করেছিলেন যে, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সাধনাই ভারতের সমৃদ্ধির সাধনা। এ বিষয়ে তিনি একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। বহু মত, বহু

ধর্ম, বহু ভাষা ও বহু ঐতিহ্যের দেশ ভারতবর্ষের ধর্মনিরপেক্ষ হওয়া ছাড়া গতি নেই। এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের শেষ দিকে যখন আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলন উত্তাল, তখন তিনি দেশের স্বার্থেই বলেছিলেন: 'Secularise the intelligentsia at least and proceed on secular lines in politics.' (Jawaharlal Nehru : by Sarvepalli Gopal).

জওহরলাল ছিলেন তারুণ্যের প্রতীক। রবীন্দ্রনাথ তাঁর চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যটি খুব প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। ১৯৩৬ সালের ৮ মার্চ। জওহরলাল পত্নী কমলার স্মরণে আয়োজিত শান্তিনিকেতনের সভায় রবীন্দ্রনাথ বলেন: 'কমলা নেহরু যাঁর সহধর্মিণী, সেই জওহরলাল আজ সমস্ত তরুণ হৃদয়ের রাজাসনে প্রতিষ্ঠিত হবার অধিকারী; অপরিসীম তাঁর ধৈর্য, বীরত্ব তাঁর বিরাট—কিন্তু সকলের চেয়ে বড় তাঁর সুদৃঢ় সত্যনিষ্ঠা। পলিটিক্সের সাধনায় আত্ম-প্রবঞ্চনা ও পর-প্রবঞ্চনার পঙ্কিল আবর্তের মধ্যে নিজেকে কখনো হারিয়ে ফেলেন নি। সত্য যেখানে বিপজ্জনক সেখানে সত্যকে তিনি ভয় করেন নি, মিথ্যা যেখানে সুবিধাজনক, সেখানে সত্যকে তিনি সহায় করেন নি। মিথ্যার উপাচার আশু প্রয়োজন বোধে দেশ পূজার অর্ঘ্য অসঙ্কোচে স্বকৃত হয়ে থাকে, সেখানে তিনি সত্যের নির্মলতা আদর্শকে রক্ষা করেছেন।' ভারতের রাজনীতিতে তাঁর এই চরিত্রের দান সবচেয়ে বড় দান।

তারুণ্য শক্তির প্রতীক হিসেবেই রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বলেছেম 'ঋতুরাজ জওহরলাল'। তিনি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে ছিলেন নব-বসন্তের উদ্গাতা। ভারতের যুব-শক্তিকে তিনি দিয়েছিলেন নতুন পথের দিশা। যুব-সমাজের কল্পনাকে স্পর্শ করেছিলেন তিনি। ১৯২৮ সালে একটি বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন: 'Spirit of adventure' যুব-শক্তির প্রধান সহায়।

জওহরলাল উপলব্ধি করেছিলেন যে, হরিজন, আদিবাসী বা অন্যান্য

দুর্বলতর শ্রেণীর মানুষ যদি নিরাপত্তালাভের সুযোগ না পায় এবং দেশের মহত্ত্বে ও মনুষ্যত্বেও অধিকার অর্জন না করে, তাহলে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন যেমন সাবিক সাফল্য অর্জন করবে না, তেমনি স্বাধীনতালাভের পরেও দেশের অগ্রগতি হবে পদে পদে ব্যাহত।

তিনি আমাদের জীবন-ধারায় বিজ্ঞান-চেতনাকে প্রবাহিত করতে চেয়েছিলেন। কুসংস্কারকে তিনি কখনও মনে স্থান দেন নি। এমন কি আধিভৌতিক ঘটনাকেও কোনও মূল্য দেন নি। স্পষ্ট করে বলেছেন: 'কোনও পরলোক নয়, কোনও জন্মান্তর নয়—আসলে এই জগৎ ও জীবনের ওপরই আমার টান। আত্মা বলে কিছু আছে কিনা, মৃত্যুর পর পুনর্জন্ম আছে কিনা আমি জানি না। এসব প্রশ্নের মতোই গুরুত্ব থাক, ও নিয়ে আমার এতোটুকু কোনও মাথাব্যথা নেই।' অবশ্য জীবনে আধ্যাত্মিকতার প্রভাবকে অস্বীকার করেন নি তিনি। ধর্ম-নিরপেক্ষতার অর্থ যে ধর্মহীনতা নয়—একথাও তিনি স্পষ্ট করে উচ্চারণ করে গেছেন।

সমাজতন্ত্রের ভাবধারা ভারতে প্রসারের ক্ষেত্রেও নেহরু ছিলেন অগ্রণী। কিন্তু এই সমাজতান্ত্রিক আদর্শ মার্কস-এর অনুযায়ী ছিলো না যদিও যৌবনে মার্কস ও লেনিনের লেখা তাঁর মনে গভীরভাবে দাগ কেটেছিলো। কিন্তু তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে, মার্কসবাদের আদর্শে যে ক্ষমতার বদল হয়, তা জনসাধারণের প্রয়োজনে লাগে না। ক্ষমতা ভোগ করে দলের লোকেরা। গান্ধীবাদ এক্ষেত্রে অনেক উদার এবং জনতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। নেহরু তাই বলেছিলেন: 'গান্ধী আমাদের পিঠ সোজা এবং মেরুদণ্ড শক্ত করে দিয়েছেন; সোজা পিঠের ওপর কোনও শক্তিই চড়ে বা চেপে বসতে পারে না।' এইদিক থেকে তিনি ছিলেন গান্ধীশিষ্য—গান্ধীজির উত্তরসাধক।

তাঁর এই সমাজতান্ত্রিক ভাবনার জন্যই আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলি বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিলো। ফ্যাসীবাদ ও নাৎসীবাদের বিরুদ্ধে ভারতে

ও ভারতের বাইরে তাঁর সংগ্রাম বিশ্ব-ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। প্রথম ফ্যাসী বিরোধী লেখক সম্মেলনে জওহরলালই রবীন্দ্রনাথের মতামত সম্বলিত চিঠিটি নিয়ে গিয়েছিলেন।

বিজ্ঞানকে জওহরলাল মনে করতেন মানব প্রগতির ধারক ও বাহক। তিনি বলেছেন ঃ 'It was science alone that could solve the problems of hunger and poverty, of insanitation and illiteracy, of superstition, of vast resources running to waste, of a rich country inhabited by starving people.' [Discovery of India] শুধু বিজ্ঞান নয়—সাহিত্য ও সংস্কৃতির সমস্ত দিকেই তাঁর ছিলো সমান আগ্রহ।

স্বাধীন ভারতের রূপকার হিসেবেও জওহরলালের এই মানসিকতা বিশেষ সাহায্য করেছে। ভারতের বর্তমান পররাষ্ট্রনীতি এবং সেই সঙ্গে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনে ভারতের নেতৃত্ব সম্ভব হয়েছে তাঁর জন্যই। স্বাধীন ভারত গড়ার কাজে তাঁর অবদান নিঃসন্দেহে বহুমুখী। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য হলো সংবিধান রচনা এবং পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থ নৈতিক উন্নয়ন। বহু জাতি, উপজাতি, ভাষা, ধর্ম এবং কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের সমন্বয়-সাধনের দ্বারা সংবিধান রচনা করে তিনি অমর কীর্তি স্থাপন করেছেন। পরিকল্পিত অর্থ নৈতিক জনস্বার্থে ছিলো অপরিহার্য। ব্যক্তিগত মালিকানাধীন সংস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে (অবলুপ্ত করে নয়) সরকারী সংস্থা প্রবর্তন করে তিনি জনকল্যাণমূলক অর্থনীতিক সমাজ ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন।

সাহিত্য আকাদমি, নৃত্য-নাটক আকাদমি, ইত্যাদি সংস্থার মাধ্যমে সাহিত্য ও শিল্পের বিকাশের ব্যবস্থা এবং সমন্বয় সাধন তিনিই প্রথম স্বাধীন ভারতে প্রবর্তন করেন। তাই দেশবাসী এই মহান স্থিতধী মানুষটিকে ভালোবেসেছে অন্তর দিয়ে। জওহরলালও ভালোবেসেছেন দেশকে—দেশের প্রতিটি উন্নয়ন প্রকল্প ছিলো তাঁর কাছে মন্দির।

তাঁর মহান ব্যক্তিত্ব যে কবি-সাহিত্যিকদেরও হৃদয় স্পর্শ করবে, তাতে সন্দেহ নেই। ভারতের প্রতিটি ভাষার কবি-লেখকরা তাঁকে নিয়ে অনেক রচনা লিখেছেন। কবিতা লিখেছেন বহু কবি। সেই সব কবিতা থেকে কিছু নির্বাচন করে বর্তমান সংকলনটি প্রকাশ করা হলো। সঙ্গে কিছু তরুণ কবির কবিতাও রয়েছে। তরুণ প্রজন্মের কাছে এই মহান ব্যক্তিত্বের আবেদনের স্বরূপটি কেমন, তা কবিতাগুলি পড়লেই অনুমান করা সম্ভব হবে।

সংকলনে আরো কয়েকজন কবির কবিতা অন্তর্ভুক্ত করার ইচ্ছে ছিলো। কিন্তু সময় মতো কবিতা না পাওয়ায় তা সম্ভব হলো না। এজন্য আমরা দুঃখিত। এই সংকলনটি প্রকাশ সম্ভব হতো না, যদি মডেল পাবলিশিং হাউসের জয়দেব ঘোষ সক্রিয় সহযোগিতার হাত না বাড়াতেন। এই সুযোগে তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তরুণ কবি বিশ্বনাথ ভট্টাচার্যও নানাভাবে সাহায্য করেছেন। তাঁকেও ধন্যবাদ। আর যাঁরা কবিতা প্রকাশের অনুমতি দিয়ে সাহায্য করেছেন, তাঁদের কাছেও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

২০-২-৮৯ আশিস সান্যাল

সূচীপত্র

ঋতুরাজ জওহরলাল

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আজ হোলির দিন।
চারিদিকে
শুষ্কপত্র ঝরে পড়ছে,
তার মধ্যে
নব কিশলয়ের অভিনন্দন।

আজ জরা-বিজয়ী
নূতন প্রাণের
অভ্যর্থনা
জলে-স্থলে আকাশে।

এই উৎসবের সঙ্গে
আমাদের দেশের
নবজীবনের-উৎসবকে
মিলিয়ে দেখতে চাই।
আজ অনুভব করবো
যুগসন্ধির
নির্মম শীতের দিন
শেষ হলো।

এলো নবযুগের
সর্বব্যাপী আশ্বাস।
আজ
এই নবযুগের
ঋতুরাজ জওহরলাল।

জওহরলাল

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

শিক্ষা-দীক্ষা পাশ্চাত্যের, ভারতের দেওয়া মন—
ক্ষমা তিতিক্ষা তব সংযমে তুমি ব্রাহ্মণ।
কমল কোমল হৃদয় তোমার সদাই নয়নে জল—
তাপসের মত কঠিন কঠোর-বিপদে অচঞ্চল।

তুমি ভারতের কুমার কিশোর শ্রেষ্ঠ সুসন্তান—
তুমি অনন্তকীর্তি তোমার জ্যোতি যে অনির্বাণ।
নূতন যুগের অর্জুন তুমি আমাদের ফাল্গুনী
যত রূপ তত ভাবৈশ্বর্য, তেমনিও জ্ঞানী গুণী।

মহাভারতের মৃত্তিকার সাথে তব অনন্ত যোগ
মৃত নহ তুমি অমৃতময় জীবন করিবে ভোগ।

জওহরলাল

নরেন্দ্র দেব

জীবনে তিনি কাউকে কষ্ট দিয়েছিলেন কিনা জানি না,
কিন্তু দূর করতে চেয়েছিলেন সকলেরই দুঃখ-কষ্ট।
দুষ্টের দমন করতে পেরেছিলেন তিনি এ-কথা মানিনা,
তাঁর প্রৌঢ় বয়সেও যৌবনোদ্ধত দেখেছি তাঁকে স্পষ্ট।

জনগণের বিশ্বাস যথাযোগ্য পেয়ে চলেছিলেন তিনি,
ভারতবাসীদের ভালোবাসতেন ঠিক ভাইয়ের মতোই ;
অহিংসা মন্ত্রে দীক্ষিত হলেও হিংসায় ভীত হতেন না যিনি
মুসলমানকে আত্মীয় বোধে ক্ষমা করতেন, অপরাধ করুক তারা যতোই।

অপরাধীকে ক্ষমা করলেও অপরাধকে চেয়েছেন দমন করতে,
সমাজতান্ত্রিক শাসনের তিনি ছিলেন একান্ত অনুরাগী,
লজ্জিত হতেন না বহু সম্মান ও সমাদরের মুকুট পরতে।
তাঁকে ভয় করতো মনে মনে যাদের মনটা ছিলো অন্যায়-দাগী।

তাঁর চরিত্রে কখনো গৌরবের বিকার ঘটতে দেখা যায়নি ;
তিনি হাসতেন, গল্প করতেন, বই পড়তেন, লিখতেনও কতো কি ;
ভাষণ দিতেন সমাহিত চিত্তে, সময়ের সীমা তাঁর নাগাল পায়নি !
সকলের শ্রদ্ধা ও প্রেমের পূজা পেয়েছে আর কেউ তাঁর মতো কি ?

একটু বেশি ভাবতেন তিনি কোনও কাজে হাত দেবার আগে,
নিঃশেষে কিছু মিটিয়ে ফেলার দুঃসাহস ছিলো না তাঁর ;
দু'কূল রেখে চলার চেষ্টাই সব ব্যাপারে তাঁর মনে জাগে—
প্রীতির প্রভাবে চেয়েছিলেন তিনি সকল অপ্রীতির সমাহার।

মানুষের প্রতি প্রেম আর প্রেমের প্রতি বিশ্বাস—
এ ছিলো তাঁর হৃদয়ের দেবোপম দুর্বলতা,
বিশ্বের মৈত্রীলাভে চেয়েছিলেন ফেলতে সহজ নিশ্বাস
জওহরলালের মনে ছিলো গাঁথা এক শৈশবের রূপকথা।

মহারথ নেহরু

কালিদাস রায়

মহাকাব্যের চরিত্র তুমি মহাকবি ছাড়া ভবে
বর্ণিতে তব বিরাট চরিত্র কাহার স্পর্ধা হবে।
মোর অক্ষম লেখনীটি নাহি সরে
নয়নে অশ্রু ঝরে।
যা বলিব ভাবি বলিতে ভুলিয়া যাই
ভারতের শোক-সাগরে পাই না থাই।

ভারতবর্ষে অর্ধ-শতক বর্ষের ইতিহাসে
আর কাহারেও হেরিনা তোমার পাশে
যার পানে চেয়ে চেয়ে
অস্থির মতি স্বস্তি লভিবে সান্ত্বনা বাণী পেয়ে।

জানি জানি দেব তুমি তো অমর নহ।
তাই বলি এই বেদনা তুবিষহ,
কেমনে ভুলিব বলিবে না মহারথ,
তাইতো কাঁদায় নয়ন ধাঁধায় ভারত ভবিষ্যৎ।

এখনো যে তার ঘুচেনিক তুর্দিন
এখনো ভারত নিয়তির পরাধীন
ভ্রূকুটি হানিছে লাল চোখে লাল-চীন।
তপে অর্জিত তুর্জয় গুরুভার
তব গুরুদেব সঁপিলেন তোমা, তাঁহারে নমস্কার।

এই সেই স্বাধীনতা

অর্জনে তার সহিলে যতেক ব্যথা

রক্ষণে তার ঢের বেশি ক্লেশ বরণ করিলে তুমি

সারা এ-বিশ্বে মহা-মহীয়সী হইল ভারতভূমি।

কত সঙ্কট কত সমস্যা করিয়াছে অভিমান

বিঘ্ন ব্যাঘাত দল বেঁধে এলো কে করিল তারে ত্রাণ ?

কাহার প্রখর মনীষা শৌর্য-সর্বংসহা নীতি

দূরিল সকল চক্রান্তের ভীতি ?

বিশ্বজিতের দাতা

নিষ্পেষিত নিঃসম্বল নিঃস্বগণের ত্রাতা

আপনারে তুমি নিঃশেষে দেশে করিয়া গিয়াছ দান

যুগ-যুগান্ত ব্যাপী সে দানের কেবা করে পরিমাণ।

প্রয়াগ তীর্থে শীলাদিত্যের মতো

সব বিতরিয়া দীনবেশে তুমি বুদ্ধ চরণে নত,

তাঁরি মতো রাজধর্ম পালন করিয়াছ অবিরাম।

ক্লান্ত আত্মা চাহিল তোমার সুপ্তির বিশ্রাম।

ঘুমাও ঘুমাও তুমি

ললাটে তোমার বুলাইছে পাণি জননী-ভারতভূমি।

জীবনের ব্রত উদ্‌যাপি বীর গেলে তুমি আজ চলি,

সারা দেশে শোকে উৎকণ্ঠার অনল উঠিল জ্বলি,

ধূম কুণ্ডলী ব্যাপ্ত তাহার সারা এ
এশিয়া জুড়ে
সে অনলে তব নশ্বর তনু পুড়ে।
সহসা গিরীশ শৃঙ্গে তোমার ভাস্কর তনু হেরি।
মাভৈঃ মাভৈঃ বাণী ঘোষিতেছে তব
বরাভয় ভেরী।

রাঙা গোলাপ মালা

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

ফুলের মালায় সাজিয়ে ডালা দাঁড়িয়েছিলাম
বাহির আঙিনায়

থম-থমে সেই দুপুর বেলায় ঃ
ভাবছি এবার যাই ফিরে যাই, মালার কুসুম
ছড়িয়ে দিয়ে যাই।
সে-ই যদি আজ হারিয়ে গেলো,—কোনও সান্ত্বনাই
আনবে নাকো অন্ধকারে আলো-করা অনন্ত বিশ্বাস।
হঠাৎ যেন কিসের আভাস
সরিয়ে দিলো গুমোট হাওয়ার তপ্ত হাহাকার,
ঘুচিয়ে দিলো সকল বাধা ; বন্ধ দ্বার
এক নিমেষে খুলে গেলো। ডাক দিলো কে —
'এসো এসো ঘরে।'

বিশ্ব চরাচরে—
সেই ডাকে আজ লক্ষ কোটি মালার ফুলে ফুলে
হৃদয়-সাগর উথলে-পড়া বিদায়-ব্যথা উঠছে দুলে দুলে।

আমার হাতে ছিলো মালা, রাঙা-গোলাপ মালা,
তোমার প্রিয় প্রতিদিনের আধ-ফোটা ফুল গন্ধ মধু ঢালা,
তাই দিয়ে যে গেঁথেছিলেম অনেক আশা করে
চোখের জলে ভিজিয়ে মালা বিছিয়ে ছিলাম
তোমার বুকের পরে।

তোমার মুখে ফুটলো হাসি, চিরকালের সেই যে চেনা হাসি
ফুলের ব্যথা ছড়িয়ে দেওয়া, তাইতো ভালোবাসি,
ভালোবাসি তোমায় প্রিয়, যেমন বাসে চন্দ্র-সূর্য-তারা
হারিয়ে গিয়েও নয়কো তোমা-হারা
এই পৃথিবী ; জন্ম জন্মান্তরে
ভাঙলে খেলা সন্ধ্যেবেলা মায়ের অাঁচল ধরে
ফিরবে তুমি চিরদিনের চেনা আপন ঘরে।

জয়-জয়-জয়

বনফুল

মৃত্যুহীনের কাছে সসঙ্কোচে আসিলো মরণ
সসম্ভ্রমে নিবেদিলো, হয়েছে সময়—
তারপর লক্ষ কণ্ঠে, জয়-জয় নেহরুর জয়।
সে বিরাট জয়ধ্বনি প্রসারিত হলো বিশ্বময়,
সে বিরাট বর্ণঘটা আকাশের জাগালো বিস্ময়
জয়, জয়, জয়, জয়, নেহরুর জয়।
কবি, নেতা, হে বীর নির্ভয়
না, না, কোনো কথা নয়—
জয় জয় শুধু জয় জয়
যুগ হতে যুগান্তরে হউক অক্ষয়
জয় জয় শুধু জয় জয়।

উদ্দেশে

অমিয় চক্রবর্তী

আস্তে সূর্যাবর্তে সরে
দিনের অক্ষরে
প্রাণ—
রাঙা ভোর সন্ধ্যাগ্নিতে ধ্রুব অবগান ;
দিয়েছিলে এই দিনে অফুরন্ত দান।

হায় বেদুইন

মনীশ ঘটক

ঘোড়সওয়ার, ঘোড়সওয়ার শোন,
মরু দিগন্তে নেই সীমান্ত কোনো।
এই ওয়েসিস! ওই ধূ-ধূ প্রান্তর,
আজ বর্ষণ, কাল আগুনের ঝড়।

শুকনো ফসল ন্যাড়া ও-খেজুর ডালের
ক'দিন মেটাবে খিদে এ-পঙ্গপালের!
তাই চেয়েছিলে তপ্ত বালুর পারে
পৌঁছোতে কোনও শস্য শ্যামল দেশে—

দুঃখ দৈন্য কান্নুন আদ্যিকেলে
যেখানে করাল কালো ছায়া নাহি ফেলে,
প্রেমের দেবতা যেখানে মধুর হেসে
নির্মল করে মলিন মর্ম কাড়ে
বেদুইন সেই স্বপ্নপুরের চাবি
কারে দিয়ে গেলে, ছল্ ছল্ চোখে ভাবি।

জওহরলালের গোলাপ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

নিত্য দেখি তবু থাকি তৃষিত নয়নে।
প্রত্যহের প্রথম সাক্ষাৎ তুমি, রঙিন গোলাপ
প্রত্যহ অপরাজেয় প্রত্যহ অমর
যেন কোন সুনিপুণ গুণীর আলাপ
কণ্টক-কঙ্কালে স্থির কষ্টের আসনে
ঋজুনিষ্ঠ। তুমি বুঝি রক্তাক্ত মাটির প্রত্যুত্তর
কঠিনের রোমাঞ্চে রক্তিম। আপনার সাজে তুমি দানী,
অতীতের স্বপ্নমাখা প্রাণে প্রাণে তুমি এক বিস্তীর্ণ আগামী।
কত ক্লেশ ক্ষয় ক্ষোভ দ্রোহ-দ্বন্দ্ব আঘাত-হনন
পার হয়ে এই এক উল্লসিত দীপ্ত জাগরণ—
বিনিদ্রিতা কুণ্ডলী শক্তির। এই এক ফেনায়িত তীক্ষ্ণ ঊর্ধ্বগতি
ব্যথার প্রদীপ-জ্বালা চিরন্তন আনন্দ-আরতি।
সত্তার গহন হতে ডেকে আনো গভীরের রসের উৎসার,
শোনা যায় বৃন্তে-দলে কবেকার শৃঙ্খল ঝঙ্কার।
তাইতো তোমারে যত্নে গেঁথে রাখি বুকের নিভৃতে কাছাকাছি
কতোদিন তুমি আছো পৃথিবীতে আমি রবো বাঁচি
দুর্গম চূড়ায় তুমি দুঃসাধ্যের সাধ
প্রথমে প্রয়াস, শেষে প্রপূর্ণ প্রসাদ।

পণ্ডিত জওহরলাল

অন্নদাশঙ্কর রায়

পণ্ডিত জওহরলাল,
নীলকে করবেন লাল।
সেকথা শুনে ভাবে নীল—
কান যে নিয়ে যায় চিল।

[১৯৩৭ সালে রচিত। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ১৯৩৬ সালের ডিসেম্বর মাসে তেজপুর অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হলে দক্ষিণ-পন্থীরা ভীত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁদের বিদ্রূপ করে এই অসামান্য ছড়াটি লেখা হয়েছে।]

জ্যোতিষ্ক সত্তা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

কালপুরুষের ধনু
নিদাঘের অভিশপ্ত রাত্রিশেষে কোনও
অকস্মাৎ দিলো কি টঙ্কার ?
ক্ষীণবৃন্ত নক্ষত্রেরা ঝরে গেলো আতঙ্ক-পাণ্ডুর।
বিহ্বল প্রভাত এলো শোকাহত আরক্ত নয়ন।
অলীক কল্পনা জানি।
অরণ্যে ও সমুদ্রে পর্বতে
পৃথিবীর হাটে মাঠে
জীবনের স্রোত নিত্য বয়ে যাবে ছেদহীন বেগে,
তবু কোনও মুহূর্তও
কোনোখানে হবে না নিথর।
সৃষ্টির প্রবাহ বুঝি চির-উদাসীন।
জন্ম মৃত্যু-ডোর হতে খসে গিয়ে তবু,
একটি জ্যোতিষ্ক সত্তা
মানুষের ইতিহাসে
রেখে দিয়ে গেলো না কি
সূর্যাংশের শাশ্বত স্বাক্ষর।
স্বাক্ষর, না অবিনাশী সঙ্কল্পের বীজ ?
সেখানে প্রাচীর তোলা
দেশে দেশে মানুষে মানুষে,
শক্তির সংগ্রাম যেথা
লোভে, দম্ভে, হিংসায় নির্মম।

শঠতা ও কৌটিল্যের শ্লাঘাময়

কণ্টকিত রক্তাক্ত প্রান্তরে

সেইখানে অঙ্কুরিত সে-বীজের সত্যমূল প্রীতির পদক

দূর করে সব ভেদাভেদ

অগণন প্রসারিত পত্রপুষ্প পুঞ্জিত শাখায়

একদিন সারা বিশ্ব ছেয়ে

বিছাইবে সুবাসিত ছায়া।

জওহরলাল নেহরু

হুমায়ূন কবীর

প্রথম শৈশবে তুমি এদেশেরে বেসেছিলে ভালো।
আকাশের দীপ্তনীল, বৈশাখের অফুরন্ত আলো
গঙ্গা যমুনার ধারা, হিমাদ্রির উত্তুঙ্গ শিখর,
বনানীর ঘনছায়া, দূরব্যাপী রিরাট প্রান্তর
বেজেছে তোমার প্রাণে ঝঙ্কারিত প্রতিধ্বনি তুলি।
ভারতের জনতারে প্রাণ দিয়ে বেসেছিলে ভালো,
সেই প্রেম চিত্তে তব অনির্বাণ যে দ্বীপ জ্বালালো,
তারি দীপ্তি চিরদিন জীবনেরে করেছে উজ্জ্বল।
দৈনন্দিন জীবনের মতো দুঃখ যতো অমঙ্গল
অতিক্রম করি তাই দেখিয়াছো আত্মা অনির্বাণ।
দারিদ্র্য পীড়িত গ্রহে রোগ-শোক অনাহার ভুলি
গ্রামবাসী কিষাণের অমৃতের লাগি যে সংগ্রাম,
করেছে তোমারে মুগ্ধ, তুমি তারে করেছো প্রণাম
মৃত্যুঞ্জয় আজি তুমি, কণ্ঠে তব বিজয়ের গান।

কাশ্মীর-ইন্দিবর নেহরু-স্মরণে

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

চাইনি তো নীহারিকা—আকাশ-গঙ্গার ছায়াপথ
নেহারি ত্রিনেত্রে তাই, ইন্দিবর, কী নির্মাণ করে
গেছো দূর ভবিষ্যৎ—
মুক্তির উদাত্ত ক্ষেত্র স্মৃতমিত রমনী সমাজ !

কী ভাগে রজনী ভোর আজ—
চন্দ্রভাগা তীরে তবু আছে জম্বু দ্বীপ
হাজার হাজার বছরের আলো-নীল লহরের সিন্ধুটিপ

[গুজরাটী]

একটি বৃক্ষ

উমাশঙ্কর যোশী

আমার দরজার সামনে একটি গাছ লুকিয়ে যাচ্ছে
আমার বিশেষ দুঃখ হয়নি, কারণ আমি চিত্রকর নই
গাছটি দাঁড়িয়ে আছে যেন কয়েকটি রেখা দিয়ে তৈরী নকশা মাত্র।

আমি গাছের গোড়ায় গিয়ে দাঁড়াই এবং দেখি
দাঁড়িয়ে আছে সব রস তার
ঝরে গেছে, যা নিয়েছিল সব ফিরিয়ে দিয়েছে।

আমার ব্যালকনি থেকে রাত্রির অস্পষ্ট আলোয়
গাছের নানা মনোভাব আমি লক্ষ্য করি
শান্ত মর্যাদাবলে কর্কশ শুষ্ক মাটির সঙ্গে গ্রথিত

ধারণ করে আছে, হৃদয়ের খুব কাছে,
শাখা প্রশাখার বাহুর মধ্যে
মৃত্যু ফল।

[অনুবাদ : জগন্নাথ চক্রবর্তী]

নরোত্তম নেহরু

বন্দে আলী মিঞা

পুরুষসিংহ ওহে লহো, নমস্কার
তোমারে হেরেছি আর জানায়েছি শ্রদ্ধা বার বার।
কোটি কোটি মানবের জয় করি হৃদয় আসন
বাঁধিয়া প্রীতির ডোরে স্নেহ দিয়া করেছো শাসন।
বাপুজীর প্রতিনিধি সেবার সাধনা মনে তার
কারার প্রাচীর মাঝে পেয়েছিলো প্রেম বসুধার—
ভারতের বীর পুত্র—চিত্তে তাঁর ত্যাগ আর ক্ষমা
তাহার পরশে দেশ হলো মুক্ত চির মনোরমা।

লৌহমানব এবে লহো নমস্কার
ধরার ধূলির মাঝে ফিরে তুমি আসিও আবার।
সারাটি জীবন কভু অবসর পাওনিকো হায়
তাই বুঝি সহসা গো অসময়ে লয়েছো বিদায়!
আর্তমানব ডাকে—ডাকে তোমা নিখিল ভুবন।
কোটি কণ্ঠে ডাকে দেব—সাড়া দাও—মেলগো নয়ন।
নরোত্তম হে নেহরু—রেখে গেছো অমৃত প্রাসাদ—
শুদ্ধ হোক দেশবাসী—ভুলে যাক হিংসা বিবাদ

নক্ষত্রের নাম

দক্ষিণারঞ্জন বসু

দুঃখেরই আরেক নাম সুখ বলি তারে—
সেই সুখ আর দুঃখ লয়ে
মানুষের মেলা বসে পৃথিবীর কিনারে কিনারে ;
সে মানুষই মৃত্যু-জয়ী সব দুঃখ জয়ে।

সে এক অমৃতলোক—
অবিরাম সংগ্রামের শেষে—
কিঞ্চিৎ বিশ্রাম :
স্থিরলক্ষ্য অন্ধকারে
জওহর উজ্জ্বলতম
নক্ষত্রের নাম।

মহাপ্রহরী

দিনেশ দাস

রক্তের স্নানে জাগলো ভারতবর্ষ
খণ্ডিত তবু—অখণ্ড প্রাণভূমি ঃ
মৌচাকে তার জমলো শান্তি মধু—
অশথ পাতায় শান্তির-মৌসুমী।

আজো কি প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থে-মহাপ্রহরী জাগে ?
নিশুতি রাতেও শুনি উদাত্ত স্বর,
তাঁর চোখে কেউ নামতে দেখেনি রাত—
অশান্ত দেশ দেয়নিকো তাঁকে এতটুকু অবসর।

নেই নেই সন্দেহ,
এই দ্বীপময়-ভারতবর্ষ সেই পুরুষের-ই দেহ ঃ
এশিয়া-পুরুষ বিশ্বপুরুষ তিনি
নেহরুকে চেনো ?   চিনি।

শুনি তাঁর স্বর ঃ
'কে-আনে এখানে বিনামেঘে কালো ঝড় ?
হে বন্ধু তুমি ভারত-সাগর ওপারে নোঙর ফেলে
হে প্রিয় বন্ধু, হিন্দুকুশের-আড়ালে আগুন জ্বেলো।
হে সুহৃৎ, থেকো দূরন্তে তিব্বতে,
গিরিপথে, বনপথে ঃ
হবে কি সমন্বয় ?

এদেশে গানের— মেশিনগানের নয়।

তবু সে যখনই ছড়াবে আমার শান্ত আকাশে
সময়ের মহামারী।
তখনই আমার চল্লিশ কোটি ছেলেমেয়ে সারি সারি
আকাশে তুলবে মাথা—
নদী-মাঠ জুড়ে অরণ্য হবে গাঁথা,
ভারত-সাগর বাষ্পেতে হবে নীল
জটিল দিগ্‌বলয়—
নিজের বজ্রে চমকাবে হিমালয়
আশ্চর্য ! অদ্ভুদ।
আরব সাগরে টগবগে লাল রক্তের বুদ্‌বুদ।'

সব কথা তাঁর হয়নি উচ্চারিত—
শব্দের ঝড় মানেনি তো বন্ধনী।
ভারতের হ্রদে সমতলে আমি শুনেছি-প্রতিধ্বনি।
শব্দের সুরধুনী,
আমার দেহের ছোট ছোট নীল
নদী-উপনদী ধমনী-শিরায় শুনি।

[অসমীয়া]

আমার স্বদেশ মানুষের দেশ

দেবকান্ত বড়ুয়া

আমার স্বদেশ মানুষের দেশ
উত্তরে উত্তুঙ্গ গিরি, দক্ষিণে সাগর,
শত নদী বুকে তার বয়, পাড়ে পাড়ে ভাঙে গড়ে কতো ইতিহাস
ব্রহ্মপুত্র, গোদাবরী, শিপ্রা আর গঙ্গা যমুনার
সুন্দরী ভারতবর্ষ, রূপশ্রী আসাম।
তবুও আমার কাছে মানুষ আপন
যে মানুষ এই দেশে বারে বারে
সাজিয়েছে রাজহর্ম্য—বিশ্বসভ্যতার
সৃষ্টির আবেগে
বন কেটে ক'রেছে নগর পত্তন
জীবনের মৃত্যুদীপ্ত তীব্র প্রেরণায়
পার হয়ে উচ্ছল বারিধি
পার হয়ে গভীর অরণ্য
দ্বীপময় ভারত গড়েছে
সাজিয়েছে কম্বোজে ওঙ্কারধাম।
আত্মার আদেশ নিয়ে অতিক্রম ক'রে হিমালয়
তিব্বতের বরফের স্তূপে যে মানুষ
মৈত্রী আর অহিংসার জ্বাললো দ্বীপ,
সেই মানুষের দেশ, আমার মহান স্বদেশ।

বারে বারে দস্যুদল আসে,
আর বারে বারে যুঝেছে সেই মানুষ
স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য স্বদেশ আত্মার,
ভারতের ইতিহাসে পাতায় পাতায় লেখা আছে আছে সেই কথা।
কখনো বা বিজয় উল্লাস
কখনো বা মূক পরাভব।

তবু বেঁচে আছি মানুষের মতো।
জীবনের মৃত্যুঞ্জয়ী আকুল আহ্বান
বারে বারে আমাদের ডাক দেয়,
আমাদের রক্তে ভিজে যায়
পানিপথ, হলদিঘাট, পলাশী
শরাইবাটের মাটি,
আমরা তার আহ্বান ক'রেছি গ্রহণ
ফাঁসিকাঠ ডাক দেয় আমাদের,
আমরা করিনি প্রত্যাখ্যান
নিমন্ত্রণ তার।

এই সেই নতুন ভারত
ঘরে ঘরে আশার প্রদীপ যার,
প্রান্তরে সোনালী ধান ;

যুবক-যুবতীর দু-চোখে
নূতন দিনের স্বপ্ন, দুই হাতে শক্তির সঞ্চয়।
বাইরে কিসের আওয়াজ ?
দস্যুদল দুয়ারের কাছে, দেশের মানুষ সাজো !

আবার এসেছে আহ্বান—
স্বদেশ রক্ষার,
আবার এসেছে, শোনো মরণের উদগ্র আহ্বান—
যে মরণ যুগে যুগে জীবনকে ক'রেছে অমর;
কে পারে উপেক্ষা করতে সেই আমন্ত্রণ?

এই দেশ রক্ষা করতে হবে।
এই দেশ আমার স্বদেশ,
এই দেশ মরমের দেশ,
এই দেশ মানুষের দেশ।

[অনুবাদ : সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়]

পথিকৃৎ

সুশীল রায়

সময় চলেছে যদি
নিরবধি—
যদিও কাব্যের মতো জীবনেও চাই মিল, চাই ছন্দযতি
থমকে দাঁড়াবার জন্যে বিন্দু-বিসর্গও নাই মতি।

চলেছে অনন্তকাল ভেদ করে অনন্ত সময়।
চলার সঙ্গেই তবে পেতে হবে বিপুল সঞ্চয়।

যাঁরা পথিকৃৎ, পথ রচনা করেছে বার বার,
ক্রমশ চলার সঙ্গে তাঁদের জানাবো নমস্কার,
তাঁদের জানাবো কৃতজ্ঞতা।
কতো ইতিহাস, কতো ইতিবৃত্ত, কথা
যুগ যুগ ধরে শুধু স্মরণের স্তম্ভ রচে যাবে—
সে-সব স্মরণ চিহ্ন আমাদেরই নমস্কার পাবে।

সময় চলেছে যদি
নিরবধি
সমস্ত চলার শেষে সমুদ্রের পতন স্থিতধী
হতে পারি যদি
তবেই জীবন ধন্য ; অন্য কিছু নহে—
যে অমর রহে, সেই রহে।

তর্পণ

হরপ্রসাদ মিত্র

না-না হাহাকার নয়,
শুধু জন-মনের জোয়ারে
স্নান করে ঘরে ফেরা,
—এই বারে বারে।
আকাশ অতন্দ্র ব্যাপ্তি,
গোলাপ গভীর কী যে রূপ!
আরো এক কথা আছে—
সে মহামৃত্যুর এই চুপ।

মিছিল কি জানে তাকে?
প্রবৃত্তি মানে কি তাকে?
তাই—
ক্ষুব্ধ পৃথিবীও বলে
এসো, শেষ নিশ্বাস নেভাই।

তারপরে অন্ধকারে—
দেখি মহাশূন্যের রাত্রিতে
হীরের গোলাপ হয়ে ছড়ায় সে যাত্রীতে যাত্রীতে।
মিছিল এগিয়ে যায়—প্রহর চলেছে অবিরত।
হীরের নির্যাস হয়ে নক্ষত্রেরা থাকেই শাশ্বত।

না-না হাহাকার নয়
এ আবার আকাশ-দর্শন।
শুধুই বিষাদে নয়, নয়-শুধু শোকাশ্রু বর্ষণ।

[পাঞ্জাবী]

আদি সঙ্গীত

অমৃতা প্রীতম

আমি ছিলাম—আর তুমিও—

এক অসীম নির্জনতা ছিলো
যা শুকনো পাতার মতো ঝরছিলো
বা সমুদ্র পাড়ের ধুলোর মতো উড়ছিলো
কিন্তু এসব প্রাগৈতিহাসিক সময়ের কথা।

আমি ডেকেছিলাম এক মোড়ে তোমাকে
প্রত্যুত্তরে যখন তুমি শব্দ করেছিলে
তখন বাতাসের গলায় থর্ থর্ করছিলো
মাটির কণা উঠেছিলো সর্ সরিয়ে
আর নদীর জল গুন্ গুন্ করে উঠেছিলো।
গাছের ডালে নিভৃত কম্পন
পাতায় পাতায় সে কী ঝঙ্কার!
পাপড়ি মেলেছিলো ফুলের কুঁড়ি
আর একটি পাখি
উড়ে গিয়েছিলো ডানা ঝটপট করে—
সেই তো কানে শোনা প্রথম নাদ।

সপ্ত সুরের সংজ্ঞা তার অনেক পরে।

[অনুবাদ : আশিস সান্যাল]

সাতাশে মে, উনিশশো চৌষট্টি

বাণী রায়

সারাদিন সারারাত তুষার ঝরছে শুধু
তুষারের নদী আর তুষার পর্বত আর
তুষারের সৃষ্টি এক।
ভারতের মানচিত্রে সেদিন তুষারে আবৃত—
ক্যালেণ্ডারে দেখা দিলো সাতাশের মে।

আমরা নিদাঘ রাত্রে টাইটানিয়া—ঘুমে
নীল আকাশের নিচে ছিলাম আমরা।
হৃদয়ে তুষার ঝরে জাগলো কখন,
অলক্ষিত তুষারের অগোচর রূপ,
রেডিওর আর্তনাদে একটি সংবাদ।

ক্রমে আরো গরমের উত্তপ্ত বাতাস,
ল্যু নিয়ে বয়ে এলো তুরন্ত মরুর ;
তুষার শুকিয়ে গেলো—লক্ষ সুমেরুর
কঠোর তুষার ঝড়ে লাগলো উত্তাপ।
অর্ধ অবনত হলো জাতীয় নিশান।

কিন্তু যদি হৃদয়ের বন্দরে তাকাও,
অটল—অচল সেই জয়ের নিশান।
সে বীর নিরস্ত্র এক অচিন্ত্য সংগ্রামে
জাগালো আরক্ত পুষ্প ভারত শোণিতে

অনেকের মনে মনে নিরুদ্ধ বাসনা
এক মানুষের মধ্যে নিলো পূর্ণরূপ ।

আমরা নিদাঘনিদ্রা ত্যাগ করলাম,
আমরা পরীর রাজ্য ভুলে যে গেলাম ;
আমরা একত্রে তাই শপথ নিলাম,
লক্ষ ফুলে চিতাভস্ম ঢেকে যে দিলাম ।

লাল গোলাপের জন্য

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

আমারও প্রিয় রঙ লাল।
আমারও প্রিয় ফুল
গোলাপ।

আমি লড়ছি
লাল গোলাপের জন্যে।

চেয়ে দেখ
আসমুদ্রহিমাচল
শোকস্তব্ধ আমাদের ভালবাসা
নতমুখে
উদ্ভিন্ন মাটির দিকে তাকিয়ে

শৃঙ্খলের ক্ষতগুলো
ভাল করে আজও শুকোয়নি ;
প্রাণের সব তার
এক সুরে এখনও বাঁধা হয়নি ;
সর্বনাশের কিনার থেকে
পৃথিবী
বরাবরের মতো এখনও সরে আসেনি।
চষা মাটির মতো এবড়ো-খেবড়ো সময়,
চলতে কষ্ট হলেও
জানি, তার গর্ভে ছড়ানো আছে বীজ।

আশাহত অবুঝ অশান্ত
আমাদের অভিমানগুলো
চোখের জল ফেলে
নবান্নের উৎসব করবে।
চোখে নয়,
এখন আমাদের বুকের মধ্যে লাল গোলাপ—
বুক দিয়ে আমাদের রক্ষা করতে হবে।

আমার প্রিয় রঙ লাল
আমার প্রিয় ফুল
গোলাপ।

লাল গোলাপের জন্য
সাহসে বুক বেঁধে—
এখন আমাদের লড়াই।

লাল গোলাপ

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

ঘণ্টা বাজে। কোথায় গম্ভীর ঘণ্টা বেজে যায়।

আমি বিশ্বভুবন তোমার
প্রসারিত হাতের মুঠোয় এনে দেবো।
তুমি কিছু দাও।
তুমি একটি ফুল দাও।
রূপকথার লালকমল, দাও
টকটকে রক্তের মতো একটি গোলাপ।

তবু কাঁপে সমস্ত ঘরবাড়ি। তবু
আকাশ হাজার-টুকরো দর্পণের মতন চৌচির।
তবু গৃহদেবতার মুখ
বেঁকে যায়। চুরমার জনতা
ছেলেবেলাকার মতো অভিমানী বন্ধুর মতন
হঠাৎ অস্পষ্ট হয়।
ঘণ্টা বাজে। কোথায় উদাস ঘণ্টা বেজে যায়।

আমি দেবো। আমি বিশ্বভুবন তোমাকে
এনে দেবো।
তুমি দাও,
তুমি কিছু দাও,
তুমি একটি ফুল দাও।

রূপকথার লালকমল দাও
টকটকে প্রেমের মতো একটি গোলাপ।

যেন গুমরে ওঠে কেউ। যেন বলে ওঠে,
‘ওরে ছেলে, ধৈর্য ধর।’
কে কাকে কী বলে, দ্যাখ,
জলস্রোতে ভাসমান, রক্তবর্ণ গোলাপের মতো
ওই তিনি কোথায় চলেছেন।
কে কাকে কী বলে, শোন,
বুকের ভিতরে
ভুবন-দোলানো ঘণ্টা বেজে যায়।

স্বদেশের কলস্বাস

জগন্নাথ চক্রবর্তী

শুধু দূরবীন নয়
সুরবীণও চাই
মনোবীণা দিয়ে বনবাণী—
এই তার
আবিষ্কার

ভূধর নদীর গান
দেশময় গ্রামের সঙ্গীত
মাটিতে রঞ্জিত
কান পেতে শোনে এক
নবীন উদ্ভাসে।

ভূখণ্ডের কলম্বাস
আকন্যা কুমারী
জল মাটি বীরগাথা
ভালবাসে
নবীন উদ্ভাসে।
চিনে নেওয়া খুঁজে পাওয়া
স্বদেশের স্বদেশীর
চিরন্তন অধিকার

এই তার
আবিষ্কার।

শুধু দূরবীন নয়
স্থরবীণও চাই
শুধুই ভূগোলে বসে
বিন্ধ্যের অচলে
মাথা খোঁড়া নয়
ইতিহাসও গড়ে তোলা চাই।

স্বদেশের কলশ্বাস
তোমার জাহাজ
এ দেশের পথে পথে ভাসে আজ!
গঙ্গার উজানে আর
গঙ্গার ভাটিতে
উত্তরে দক্ষিণে পুবে
উর্বর মাটিতে
চিনে নিতে হবে মানুষের—
স্বদেশের স্বদেশীর—
অধিকার
এ তোমার
আবিষ্কার।
শুধু দূরবীন নয়
স্থরবীণও চাই।
মনোবীণা দিয়ে বনবাণী।

জবাহরী

অমিতাভ চৌধুরী

দেশটা হলে খণ্ডিত—
জবাহরলাল পণ্ডিত,
ভারত করেন আধুনিক,
জোট ছাড়া নির্বাধুনিক—
কারখানাতে মণ্ডিত।

স্বাধীনতা

রঘুবীর সহায়

চারদিক থেকে চারদিকে
উচ্ছন্ন ঘর ছেড়ে
অন্য উচ্ছন্নের দিকে চলেছে সব
ক্ষুধা আর অপমানের ঠোক্কর খেতে খেতে।

ইতিহাস, পীড়নের ইতিহাস বলছে তাদের
এখান থেকে ওখান পর্যন্ত ছড়ানো এই যে জমি
তবু ওদের ঘর নেই
ওদের ছেলে মেয়েরাই ওদের ঘর।

অনেক বড় দেশে অনেক মানুষের যন্ত্রণা
বড়তে রূপান্তর হয় না
হত্যাকারীরা ছোট করে দেয় সবকিছু
তা বিক্রি করে দিতে ও বিদেশে চালান দিতে।

এই পাহাড় জঙ্গল মাটির সবুজ আঙিনা
কেবল ছোট হয়ে যাচ্ছে—ইতিহাসে অথচ প্রমাণ ছিলো।
কিন্তু তার বিশালতার কোনও গুণ-গান আর শোনা যায় না
দেশ বড় হবার গৌরব এখন
ব্যক্তির বিদেশে প্রতিষ্ঠা বাড়ানোর মধ্যে।
দেশে হত্যা, খুন আর বিশৃঙ্খলা
আজ যেন ভারতীয় সংস্কৃতির মূল্য—

কষ্ট অনিবার্য মনে করে লোক দয়া দেখায়
দয়ার পাত্রকে ;
লুণ্ঠন তছনছ করে দিচ্ছে দেশের নিজস্ব জমিকে।
একদা কোথাও এর বীজ ছিলো
তা নিজের হাতে তুলে নাও
আর দেশের মাটিকেও !

আমরা আমাদের ভূগোলই ভুলে গেছি
তাই প্রতিটি হত্যা
মনে হয় আমার থেকে অনেক দূরে
যদিও তা হচ্ছে আমার কাছেই।

আমরা হত্যাগুলিকে মনে রাখি, নিহতের মুখ মনে রাখি না
বেঁচে থাকতে তাদের ছবি কদাচিৎ ছাপা হয়
যারা রূপবান তাদের মুখ বার বার ছাপতে দেখা যায়
লাশের পাশে বেদনায় দাঁড়িয়ে ছিলাম—
প্রতিদিন আমরা জানছি
ওই নিহত মুখগুলি আমাদের নয়।

আজ ওই কখন-ঢাকা মুখ
বেঁচে থাকা বিক্ষতের সঙ্গে বাঁচার নিদর্শন
আর সেই মুখগুলিকেই মনে রাখা যায় না
সমাজের ওপর প্রভুত্ব করছে ওই সব
মুণ্ডহীন লোক
কাল যারা কোনও বড় দেশের গোলাম হয়ে যাবে।
আর আমাদের দেশের উচ্ছন্নতা খুঁজতে থাকবে আমাদের মুখ
—স্বাধীনতা।

[মূল হিন্দী থেকে অনুবাদ : আশিস সান্যাল]

কেন অন্তত দশ বছর আরও

অরুণ বাগচী

সেদিন যদি তোমার বয়েস দশ বছর কম হত
মানতে কি কাটাকুটির অঙ্ক, শকুনির সঙ্গে পাশা খেলা
ঝরতে কি দিতে চিরন্তন স্বপ্নকে হেমন্তের পাতার মতো
নেকড়ের পাল আসছে দেখে সহযোদ্ধাদের বলতে না থামো ?

সাতচল্লিশের সেই প্রহরে একদিকে সূর্যোদয় অন্যদিকে অনন্ত রাত্রি
এদিকে আশ্বাস-বসন্ত ওদিকে রক্তের অফুরান নদী
চল ভষ্ম থেকে ভবিষ্যৎ গড়ি যেটুকু জীবন আছে তুমি বললে
সেই তোমার বয়েস যদি এক দশক লঘু হত !

অপ্রস্তুত আমাদের নিয়ে এলে আধুনিক শতাব্দীতে
আকাশের বুকে একে একে সব জানলা খুলে দিলে
বললে পিছে যা পড়ে থাক পিছনে বরণীয় সবই তো সামনে
ভোরের সব আলো ঝলমল পরিশ্রমের ফসলে প্রকৃতির অঙ্গনে।

কবে স্বপ্নকে আড়াল করে তোমার দুচোখে অমন বিষাদ জমল আগে দেখিনি
কত কত ক্লান্ত ছিলে বুঝলাম যেদিন মনে হল কেন আরও দশ বছর রইলে না !

একজন নিন্দুকের উপলব্ধি

সুনীল বসু

আমি যে অতি নিন্দুক, ঘোর নিন্দুক,
না হলে চায়ের টেবিলে, অফিসে, কাছারিতে
না হলে যে-কোন আড্ডায় যে-কোন তর্কে তোমার নিন্দা,
তোমার সমালোচনা, তোমার ভুলচুক নিয়ে অবিশ্রান্ত তর্ক
করেছি কেন?
আমি ভারতবর্ষের বিশাল মাটিকে ভালোবাসি নি
আমি নদী পর্বত গিরি গুহা ক্ষেত খামার চাষী মজুর
আমি দারিদ্র্য, ক্ষুধা, অনাহার, উপবাস
আমি শয়তান, সুবিধেবাদী, দালাল, জোচ্চর, দেশদ্রোহী
এসব আমি কিছুই দেখিনি, জানি না, চিনি না, শুনি না,
আমি ধোপদুরস্ত শহুরে বাবু, চায়ের কাপের সঙ্গে রাজনীতির
ঘোর চর্চা
এবং দেশনেতাদের নিন্দায় পিণ্ডদান করি,
আমি তর্কচঞ্চু সর্ববোদ্ধা নিষ্ঠুর নিন্দুক।

অথচ সমুদ্রে এতো ঢিল ছোঁড়া, কোন তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ হয়নি
এতো বাক্ স্বাধীনতা, কোনদিন কণ্ঠরোধ হয়নি,
এতো সুউচ্চ গরিমা
সমালোচনার খন্তা, শাবল, দড়ি, পরিশ্রম, পরাজয়ের উদ্যম
সেই আদর্শের সানুদেশে বহুবার আমাদের বিপরীত অভিযান
পণ্ড হয়ে গেলো,

দেখেছি গোটা ভারতবর্ষ তোমার পিছনে
দেখেছি সমস্ত পৃথিবী তোমার আহ্বানে সাড়া দিচ্ছে
দেখেছি আমার অবিশ্বাস
কোটি মানুষের বিশ্বাসের প্রচণ্ড ফুৎকারে ধূলিসাৎ হয়ে গেছে
আমি বার বার তোমার কর্ম্ম-উদ্দীপনার চুল্লীর ভিতর
তোমার শুভ সঙ্কল্পের তেজিয়ান ঘোড়াগুলোর সামনে
বার বার অকিঞ্চিৎকর হয়ে গেলাম
আমি ক্লান্ত হয়ে নিজের নিন্দার জঞ্জালে নিজেই
ধুলো হয়ে ধ্বসে গেলাম।

তোমার গায়ে একটু আঁচড় দিতে গেলে
বুঝেছি এই মৃত ভারতবর্ষকে জীবন দিয়ে ভালোবাসতে হবে
বুঝেছি চায়ের কাপের রাজনীতি পায়ে আছড়ে ভেঙে
বিশাল ভারতবর্ষের মাটির চন্দন কপালে পরতে হবে
বুঝেছি সুখ নয়, কোটি জনতার জন্যে আমার
নিদ্রাহীন চিন্তায় মগ্ন হতে হবে
বুঝেছি ফুলবাবু নয়, বস্ত্রহীন-খাদ্যহীন
স্বাস্থ্যহীন মানুষের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে
আশ্বাসের অভ্রান্ত প্রতিজ্ঞা নিয়ে
আমি জানি, সেদিন তোমার আমি আর নিন্দা করবো না
দুর্বল হাতে দু'একটা সমালোচনার ঢিল সমুদ্রে ছুঁড়ে
আমি আর খেলা করতে চাইবো না
আমি জানি অন্তত তখন ছোট ছোট অভিমানে আমার সমুদ্রের
কিছু কিছু অভিজ্ঞতা জমে উঠেছে
অতএব আমার নিজস্ব জাহাজ, সমুদ্রকে নমস্কার করে
খুব সাবধানে ভাসাতে হবে।

ভালো লাগে

গৌরাঙ্গ ভৌমিক

ভাবতে ভারি ভালো লাগে, জেলখানার ঘুলঘুলিতে
চোখ রেখে একটা মানুষ আকাশ দেখতেন এক সময়ে।
আকাশের সঙ্গে জমে উঠত তাঁর আলাপ।

এই মানুষের বুক পকেটে থাকত তাঁর প্রিয় গোলাপ।
এই মানুষের চোখের সামনে হাজার যুগের মানুষ
নাচত, গান গাইত, মিছিল করে আসত।
নাকি ইতিহাসের ডানা মেলে উড়ত তাঁর কল্পনার রাজহাঁস ?

ভাবতে ভারি ভালো লাগে, এই মানুষের ইচ্ছে ছিল
মাটির সঙ্গে মাটি হয়ে মিশে যেতে। এই মানুষের স্পর্শে
হালকা হয়ে যেত এদেশের আকাশ-বাতাস।

এইখানে তাঁর নিশ্বাসের শব্দ শোনা গিয়েছিল, এইখানে
তাঁর নিশ্বাস ও প্রশ্বাস।

রক্ত গোলাপ

রমেন দাস

কারণে বা অকারণে আকাশে যখনই রাখি চোখ,
মেঘে ঢাকা তারাগুলো সব
বেদনার ভারে কাঁপে, অরণ্যের গাঢ় অন্ধকারে
পাখিরাও বিষণ্ণ নীরব।
শতাব্দীর অন্তরাত্মা শান্তি খুঁজে খুঁজে
ক্লান্ত ; তবু পেতে চায় অমৃত-সন্ধান,
বিক্ষত সংগ্রামী মন বিপ্রলব্ধ জীবনের হাটে
পরাভূত, বেদনায় ম্লান।

অথচ এখানে এক আশ্চর্য রক্ত গোলাপ—
প্রত্যয়ের স্বপ্ন আঁকে ঃ নক্ষত্রই সূর্য হবে,
মুছে দেবে ব্যর্থ অভিশাপ!

উপলক্ষ ঃ নেহরু জন্মশতবার্ষিকী

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

ধরা থাক
মহাবিশ্ব পরিক্রমণ করে আপনি গতকাল ভারতে ফিরলেন।
শুনলেন, প্রিয়দর্শিনী শহিদ হয়েছেন
আপনার সন্ততি দুধে-ভাতে আছে।
দেখলেন, আপনি যেমনটি চেয়েছিলেন—
যন্ত্রশিল্পের জয়পতাকা উড়ছে অব্যাহত ;
গণতন্ত্র লাট খায়নি।

অথচ বাতাসে পোড়া পাতার গন্ধ। আপনার কষ্ট হল।
খুঁজতে খুঁজতে আপনি আবিষ্কার করলেন
কোথাও
বড় রকমের একটা ভুল হয়ে গেছে।

সেই যে অনেক বছর আগে
সংঘর্ষ ছেড়ে মীমাংসার,
অর্জন ছেড়ে বিলি ব্যবস্থার,
সংগ্রাম ছেড়ে আপোশ মিটমাটের নিরাপদ রাস্তা
আপনি দেখিয়ে দিয়ে গেছেন,
আমরা সেই পথেই হাঁটছি।
দিয়ে থুয়ে আমাদের হাতে আর কিছু থাকে না,
লজ্জা ঢাকতে গিয়ে খসে পড়েছে বুকের কাপড়।

মানুষের প্রিয়তম সম্পদ তার জীবন
এখন একদিনের ক্রিকেট খেলার মতো,
যে-যার রান তুলতেই ব্যস্ত। কাল কী হবে
ভাবছে কেবল তারাই
ব্যাটবল থুইয়ে যারা পথে বসা। আপনার কষ্ট হল।

অনেক কাল আগে লাহোর কংগ্রেসে আপনি বৈষম্য মোচনের কথা বলেছিলেন।

তখন দেশপ্রেমে দায়িত্ব ছিল কম,
এবারে আপনি অন্তত বলে যান ঃ
পৃথিবী গরম হয়ে উঠছে, আমি জেনে এলাম,
তোমরা সাবধানে থেকো।

আমার সম্রাটের প্রতি

কবিতা সিংহ

সম্রাট মুকুটখানি রেখে দিয়ে চলে গিয়েছেন
পিছে রেখে গিয়েছেন কীর্তি যতো, খ্যাতি যতো ভঙ্গুর সম্মান।
ছিন্নপত্রে ম্লান গুড়ে অলঙ্কৃত শোকের প্রস্তাব।
শব্দ মায়া জীর্ণ লাগে, শব্দ মায়া অসুরী রচনা।
শোকের উৎসবে বড় ঝঙ্কৃত বাজনা
বড় তীব্র আলো বেঁধে।

আমরা কেউ উৎসবে যাবো না।
ভঙ্গির পোশাকগুলি গায়ে বড়-বাজে
শব্দ যদি ব্রহ্ম তবে শব্দের জঞ্জাল ভেঙে—
আজ শুধু প্রেম তুলে আনি।

শান্তি পারাবারে আজ তাঁর তরণী।
শান্তি পারাবারে এক মোহন তরণী।
মোহন তরণী তাঁর প্রেম ভিন্ন পাথেয় নেবে না
এসো আজ দুঃখে এক, প্রেমে এক, সম্মিলিত হেঁটে যাই
তাঁর মিছিলে।
নতশির হেঁটে যাই একত্রে, একেলা।

অশ্রুগুলি ফুটে থাক লজ্জা নেই।- প্রেম
প্রেম লজ্জারও চেয়ে দীন,
এই এক সমাধিতে পৃথিবীর অন্য ফুল ব্যর্থ হয়ে গেছে।

সম্রাটের সমাধিতে অন্য ফুল ব্যর্থ হয়ে গেছে।
কারণ হৃদয়গুলি অসংখ্য গোলাপ।
কারণ হৃদয়গুলি রক্তের গোলাপ।

কারণ-আদেশ পেলে যে কোনও হৃদয়
গোলাপ কাঁটায় বুক সারা রাত
সারা রাত যে কোনও হৃদয়
সমস্যা বিবর্ণ ফুল লালে লাল করে দিতে পারে
সম্রাট বরাত দিলে যে কোনও হৃদয়।
বোতাম বন্ধের মুখে এক সন্ধ্যায় আয়ু জেনে গিয়ে যে কোন হৃদয়
তবু খুব অদ্ভুত রক্তিম এক গোলাপের কুঁড়ি হতে পারে।

এই এক সমাধিতে আজ ফুল বাড়তি হয়ে গেছে।
যতদূর চেয়ে দেখ আসমুদ্র হিমাচল রক্ত ফুটে আছে
শান্তি পারাবারে আজ তাঁহার-তরণী।
শান্তি পারাবারে তাঁর মোহন তরণী।
মোহন তরণী তাঁর প্রেম ভিন্ন পাথেয় হেরে না।
সম্রাট মুকুট তাঁর-রেখে দিয়ে চলে গিয়েছেন।

সব ফেলে ফুলগুলি নিয়ে গেলো মোহন তরণী

রক্তাক্ত গোলাপের নির্যাস

সুবোধ দাশগুপ্ত

একদিন ঘুম ভাঙতে সূর্য ওঠা দেখেছিলাম
দেখেছিলাম মাঠভরা ধানের সবুজ মুখ।
সেদিন আলোর জোয়ারে ভাসিয়ে নিল
আমার স্বপ্ন দেখা চোখদুটো আর
বসন্তের হাওয়া ভেজা মুখ।

হঠাৎ কখন বৈশাখের ঝড় এলো—
সেই ঝড়ে উড়ে গেল সমস্ত পাখির বাসা,
বনস্পতিরা একে একে হোয়েছে শহিদ
শুকনো মালায় জড়ালো ধুলো মাখা আশা।

অবশেষে সূর্য উঠলো দ্বিখণ্ডিত হয়ে,
প্রতিধ্বনিত হল এপারে ওপারে—
হাহাকার প্রাণের ক্রন্দনের ভাষা।

তোমার দেওয়া চারাগাছে
চল্লিশ বছর ধরে জল সেচ করেছি,
চল্লিশ বছর ধরে বেঁচে আছি, সন্দিগ্ধ অস্তিত্ব নিয়ে
এক ফোঁটা রক্তাক্ত গোলাপের নির্যাসের আশায়।

তিনি

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

শুনেছিলাম সকলকে সামনে রেখে
তিনি দূরের আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলেন
পড়েছিলাম তাঁর মেয়ের প্রতি
মমতাভরা চিঠিগুলি
আর গোলাপ দেখলেই তাঁর কথা মনে পড়ে
তিনি এখনও
আমাদের অনেকখানি জুড়ে রয়েছেন।

অমর রহ নেহরুজী

সলিল লাহিড়ী

বারুদ ছিল মনের মধ্যে,
সাহস ছিল বুকের মধ্যে,
শপথ ছিল কঠিন ঋজু—
স্বাধীনতার অঙ্গীকার।
স্বাধীন ভারত প্রজ্বলময়,
জাগিয়েছিলে স্বাধীকার।
তোমার হাতেই উড়েছিল—
স্বাধীনতার বিজয়ভার ॥

স্বপ্নমায়ায়, রক্ত আভায়,
প্রেম-মমতার তৃপ্ত ছায়ায়,
নিজের পায়ে ঋজু হয়ে
দৃপ্ত পদে দুনিয়াতে চলার গতি—
তুমিই সেদিন এনেছিলে।
এনেছিলে বন্ধ্যা মাটির বুকে বুকে
সবুজ প্লাবন, হয়েছিল বন্ধ্যাভূমি
রসবতী, শস্যভারে ফলবতী ॥

তোমার বাণীর দীপ্তভাষায়,
জেগেছিল নূতন আশায়—
শহর থেকে প্রান্তদেশের শতমানুষ।
জেগেছিল শিল্পজগৎ নূতনতায়।

বিজ্ঞানেরই যাদুর ছোঁয়া—ছড়িয়েছিলে
শহর থেকে গ্রামে গ্রামে।
জেগেছিল নূতন ভারত নবীন আশায়।
নবদিগন্ত খুলেছিলে সেদিন তুমি ॥

তোমার আশায়, ভালবাসায়
শিল্পী আঁকে আশার ছবি, দৃপ্তভারত।
লেখক লেখে নূতন কথা, সৃষ্টি করে নূতন জগৎ।
তোমার স্নেহের স্পর্শ পেয়ে, বিশ্বশিশু
খুলেছিল হৃদয় তাদের ভালবাসায়,
জড়িয়েছিল তোমায় তারা
"চাচা" বলে, হৃদয় দিয়ে, প্রীতি দিয়ে।
অনুরাগে তুমিও তাদের ভরিয়েছিলে, সৌরভে তো।

এই যে ভারত দৃপ্তপায়ে, আজকে দেখি বিশ্বজুড়ে বন্দিত।
সেই ভারতে প্রথম সোপান তোমার হাতেই সজ্জিত।
তাইত বলি শ্রদ্ধাভরে কৃতজ্ঞতায়
ঋণী মোরা সহস্রবার তোমার কাছে।
অমর রহ, অমর রহ নেহরুজী
এই মাটিতে, সবার কাছে, সবার মাঝে ॥

ওই সেই তরু

আলোক সরকার

ওই সেই তরু।   আমরাও রীতিবহির্ভূত নই
আমরাও অঞ্চল পেতেছি পদতলে।   আমরাও
জেনেছি ফলের রীতি স্বাস্থ্য আর হিম অবক্ষয়।
ওই সেই তরু আর বীজের নিয়তি।   আমাদের
চিনে নিতে বিলম্ব হয়েছে ?   কেন হবে ?   আমরা তো
কোথাও দেখিনি তরু, শুধু সেই থাকা, শুধু স্থির
নিশ্চিত অভ্রান্ত উপস্থিতি।   আমরাও মাটির নিয়ম তার
আজ্ঞাবহ—সে যে কত কমনীয়, কত প্রীত, বুক ভরা
প্রভু ডাক !   এমন কি ডাকাও তেমন কোন আবশ্যিক নয়—
অঞ্চল পেতেছে যেই সারাটা উদ্যান ভরে অনির্বাণ
অতীত আগামী সেই চিরদিন—চিরদিন কত দীর্ঘ দেখ।
কতদিন নির্মোহ নিশ্চিত ওই তরু—ওই সেই তরু
ওই সেই দায়িত্বচেতন উপস্থিতি।   ওই সেই
হিম গুরু গুরু ধ্বনি, অঞ্চল বিছান পদতলে।

স্বপ্নের সম্রাট

আনন্দ বাগচী

বহু ঝড় বন্যা গেলো দেশ ছেড়ে, দারুণ সঙ্কট—
অনেক বিক্ষোভ-ক্ষোভ, অন্তর্ঘাতী জন কোলাহল
চতুর্দিক জুড়ে শুধু-আলেয়ার আলো মরীচিকা,
ভ্রান্তির বিলাস, বহু ভানুমতীর উচ্চাঙ্গের খেল ঃ
রাজনীতি যাকে বলে, ডানে বামে বিচিত্র জলধি
কেবল তরঙ্গ ভঙ্গে নিঃসঙ্গ সাগরবেলা ছোঁয়।

দৃপ্ত ঘোড়সওয়ার তুমি, জনপথ রাজপথ করে
দ্রুতবেগে চলে গেছো নির্ভীক হৃদয়ে ঋতুরাজ।
তুমি চির যুবা, তুমি চিরজয়ী পতাকা বাহক ;
হিংসার-উন্মত্ত পৃথ্বি বিনিদ্র নয়নে চেয়ে আছে,
মৃত্যুহীন মানবতা, বুদ্ধ অশোকের সঞ্জীবনী
বিশল্যকরণী-হবে, অমৃতের পুত্র কোনখানে?
শান্তিনিকেতন হবে জতুগৃহ। অবিচল স্বপ্নের সম্রাট
ব্যানার হোর্ডিং এ জ্বলে প্রত্যহের মারাত্মক স্টাণ্ট।

জওহরলাল নেহরু

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

কোথাও যে কিছুই থেমে থাকলো না,
এক এক স্তবক দৌড়ে গিয়ে তৃণাদপি অদপিতি চড়ুই
প্রাচীন প্রথা ভাঙলো তাদের,
সে শুধু তোমার জন্য।

আমাদের মা
'সুমন, বাবা সুমন,
অন্ধকার হয়ে এলো।
সব অন্ধকার হয়ে এলো'—
বলতে বলতে মুষড়ে পড়া দিগ্বধূর মুখের উপর
হলদে মাথা খঞ্জন পাখিদের খুলে দিয়ে বলতে থাকলো।
ওরা ওকে চিরদিনের মতো পেয়ে গেলো।

মাকে আমি সান্ত্বনা দিতে গিয়ে
বোকা বনে গিয়েছি ;
কেননা, আজকের মতো কখনো
কোনো মন্দিরে একসঙ্গে এতো শিশু আমি দেখিনি,
বুঝিনি যে দুঃখের বাগানে দেবতা হয়ে যাবে শিশুরা এমন করে।
আমি মন্দিরের গর্ভগৃহে যাবো, আমায় তোরা ছেড়ে দে
'আমি তিব্বতী বণিকদলের কাছ থেকে মৃগনাভি আনতে চলেছি
'কাকে সাজাতে চলেছো তোমরা কাকে ?

'ওগো তোমরা আভুবন হুলুধ্বনির বকুল ছড়াও
'আততায়ীরাও কি আত্মা বদলে নেবে বৈতালিক গানে ?
'শোনো তোমরা, দরোজা থেকে মানুষকে ফিরিয়ে দিয়ো না আর
'শ্বেত পাথরের মেঝের উপর দিয়ে রৌদ্রের নদীটিকে বহে যেতে দাও
'ঝাউ-জানালা দিয়ে মানুষের মুখ দেখবো আমি এবার থেকে—'
সমস্ত পথে-পথে জলপ্রপাতের উচ্চকিত সংলাপ শুনেছি, আর
স্তম্ভিত ঠোঁটের অরণ্যে বিস্ময়ের মর্মর।

চৌ-মাথায় উচ্ছল যে শিশুটির হাত থেকে
সাত রঙের ঘুড়িটা কেড়ে নিলো সূর্য
তার বুকের ঝিনুকে গোলাপ গুঁজে দিয়ে
আমিও ঐ ভিড়ের মধ্যে মিশে যাবো।

তোমার নাম

অর্ধেন্দু চক্রবর্তী

তেতে-ওঠা মুখ
থাকুক
যেমন থাকে
অঙ্গীকারে

এসো—
দুরন্ত চিবুক নিয়ে
মেতে উঠি
বোধে

এরকম-ই
মানায় এখন
ধুলোয় আঁধার করা পৃথিবীতে।
ভুলেই ছিলাম
তোমার নাম
শীত পেরুতেই
ফণা তুললো।

নেহেরুর উদ্দেশ্যে

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

তুমি যেদিন প্রয়াত হ'লে
সেদিন আমি সিমলায়,
বারান্দার রেলিং ধ'রে একা।

"চাচা নেহেরু জিন্দা হ্যায়"
গর্জে উঠলো জনগণের গলায়,
ধ্বনি এবং প্রতিধ্বনি পাহাড়ে পর্বতে—
এমন লোক মরে না কোনোদিনও।

একটি শিশু টালমাটাল পায়ে
মোড়ের মাথায় ছোট্ট একটা বাগান থেকে
তুলে নিলো দপদপানো গোলাপ,
তারপরে যখন তোমার বুকের জামার খাঁজে
পরিয়ে দিতে গেলো
তখন তুমি নেই,
বাইরে কি সূর্য অস্ত হ'লো?
অনেক গোলাপ তুলে তুমি চ'লে গেলে॥

আনন্দ মিছিলে

[জওহরলাল নেহরুর স্মৃতিতে নিবেদিত]

বাসুদেব দেব

রক্ত আর আগুনের মধ্য দিয়ে
সে চলেছে সবুজের দিকে
অবরুদ্ধ ছিল জলধারা বৃত্রের কঠিন অভিশাপে
সে খুলে দিয়েছে কারাগার
ফিরে আসে তৃষ্ণার উত্তর
ফিরে আসে স্বপ্ন, ফেরে শস্যবীজে নবান্ন উৎসব

এ আর এক অন্বেষণ, ভিতরে বাইরে
নিজেকে ছড়িয়ে দেওয়া খামারে ও কলে
ঐতিহ্য নীলিমা থেকে বিস্তারিত ঘাসের শিকড়ে
ফিরে আসে শহীদ স্মৃতির গানে
আগামীর প্রাণবন্ত বর্ণ পরিচয়

'সে তোমারই জয়' গঙ্গা গোদাবরী যাক মিলে
তোমাকে নিবিড় চিনি আমাদের প্রতি পদক্ষেপে
সংগ্রামে ও ভুলে শতাব্দীর আনন্দ মিছিলে

হস্তান্তর

বিজয়া মুখোপাধ্যায়

বিচ্ছিন্ন তো করতে হতই। চল্লিশ বছর আগের
সে ছবি স্পষ্টত
মনে রেখে কুঁজো হয়
কিছু বৃদ্ধ হীনমান গনগনে মানুষ

বিচ্ছিন্নতা আবশ্যক ছিল
বৃহৎ স্বার্থের শর্তে অল্প কিছু ত্যাগ, সে তো
শাস্ত্রেও বলেছে। তবে—এটুকু সইবে না?

তবে ওই, ওই অংশ—
এঁদো জমি, খালবিল, চণ্ড ঘূর্ণিঝড়
আর কিছু গনগনে মানুষ—
এ কি খুব চড়া দাম ছিল?

এতদিন পরে
এসব প্রশ্নের কাঁটা অবান্তর—তবু
থেকে যায়
স্মরণে, গোলাপ বৃন্তে
একটি দুটি কাঁটা।

অনেক বছর পরে

[জওহরলালের জন্ম-শতবর্ষে]

আশিস সান্যাল

অনেক বছর পরে
যেতে যেতে
কে যেন শব্দ করে হেঁকে উঠলো :
'দরজা খোলো'।
সেই শব্দের প্রতিধ্বনি
ছড়িয়ে পড়লো
চারদিকের নিস্তরঙ্গ শ্যামল বাতাসে।

দরজা খুলতেই
একরাশ মসৃণ হাওয়া
ধুয়ে দিলো আমার
অন্ধকারের মধ্যে পড়ে থাকা ক্লেদাক্ত শরীর।
জবাকুসুম আলো
মুছে দিলো ধূলি-ধূসর হৃদয়।

উর্বরতার নির্মল আস্বাদে
জেগে উঠলো
চারদিকের ধূমায়মান সব বীথি।
প্রাঞ্জল আকাশে
উড়ে গেলো
এক ঝাঁক সোনালী রঙের পাখি।

অনুভব করতে পারলাম,
আমার মধ্যে
প্রবাহিত হতে শুরু করেছে
সেই আকাঙ্ক্ষিত
প্রবল ঐতিহাসিক ঝড়।
পরিশুদ্ধ মানবতার জন্য।

মৈত্রীর রক্ত গোলপ বুকে

সজল ভট্টাচার্য

আজ আমাদের কবিতা আবার ঝড় তোলে
ওয়াশিংটনে, লণ্ডনে, প্যারীতে······
প্রাচ্য-প্রতীচ্য আবার সংস্কৃতির সাঁকো গড়ে।
জটিল, কুটিল আক্রমণ ব্যর্থ করে
ভালোবাসা অহিংসা জাগায় আশা।
ম্রিয়মান কুয়াশা সন্দেহ, ভয় ও হিংসা।

বিশ্বযুদ্ধের করাল গ্রাসে সবার মন বিষাদ-সিন্ধু
আবার যুদ্ধের মহড়ায় মত্ত, উন্মত্ত পৃথিবী।
এমন সময়, শান্তি মৈত্রীর রক্ত-গোলাপ বুকে
এগিয়ে এল বিশ্ব-প্রেমিক অহিংস জওহর।
মেঘের কোলে ফুটে ওঠে জ্যোতি—
অহিংসা ও শান্তিপুর্ণ সহাবস্থান।
······

তৃতীয় ভুবন, এগিয়ে চলে ধীরে ধীরে,
নুড়ি-ঢালা প্রেমে ছাওয়া স্বপ্নের সৈকতে।
পাশে রেখে হিংসার অস্থির সমুদ্র।
হিংসার ঢেউ এলে অহিংসার—
রৌদ্রময় তট—বাড়িয়ে-দেয়
ভালোবাসার, প্রেম ও প্রীতির হাত।

সেই পথ

দেবী রায়

'The woods are lovely, dark and deep
But I have Promises to keep
And miles to go before I sleep
And miles to go before I sleep.

—Robert Frost.

ঘুমে তলিয়ে যাওয়ার আগে
জেনেছিলেন তিনি, পাড়ি দিতে
হবে সেই দুর্গম পথ······
যে পথে রয়েছে অঙ্গীকার
যে পথে রয়েছে এক দৃঢ়-শপথ

জেনেছিলেন একান্তভাবে মনে
সব থেকেও কারা সর্বহারা আজো
(বাজো, তুমি আপনমনে আলোয়-আলোয় বাজো।)
কারা আজো দারিদ্র্যের পীড়নে
আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা······
দারুণ বৈভবে-ও সেই সন্ন্যাসীর
নিরন্তর ব্যাকুল হয়ে কাঁদা।

জেনেছিলেন যুদ্ধ নয়
শান্তি চাই, চাই শাশ্বত
এক ঐতিহ্যবাহী ভারত

কিন্তু, কোথায় সেই পথ……

ধ্বংস নয়, চেয়েছিলেন পুনর্গঠন
ধর্ম বলতে যে,
জগদ্দল-পাথর কে—
বোঝায়, সমস্ত জীবন ধরে চেয়েছিলেন তারই অপসারণ।

কোথায় সেই পথ ?
কিন্তু, কোথায় সেই পথ ?

জওহরলাল এবং

সজল বন্দ্যোপাধ্যায়

জওহরলাল মানে
স্বপ্ন
এবং
ভারতবর্ষ মানে
বাস্তব

জওহরলাল মানে
আবেগ
এবং
ভারতবর্ষ মানে
সমস্যা
এবং
তার মোকাবিলা মানে
যুক্তি

জওহরলাল
ভারতের খোঁজ করেছিলেন
এবং
কিসের খোঁজ পেয়েছিলেন!

গোলাপ

মঞ্জুষ দাশগুপ্ত

তখন পঞ্চান্ন সাল। খড়্গপুর আই আই টিতে তুমি
সমাবর্তনের দিনে এসেছিলে। সামান্য ছাত্রটি
দেখল তোমাকে। খুব কাছ থেকে। আমার সুন্দর।
সে সেদিন কী কী ভেবেছিল আজ তার স্পষ্ট মনে আছে!
ঘুমুতে যাবার আগে অরণ্য সমুদ্র ভেঙে ভেঙে
রোদ্দুরের খর মরুভূমি পার হয়ে যেতে হবে
নিজের স্বপ্নের দেশ গড়ে নিতে যা কি না তোমারো।

সবুজ বিপ্লব হয়ে গেছে, ঝরে গেছে শুভ্র দুধ
তবুও শান্তির চেয়ে সন্ত্রাস কেন যে কাম্য হয়!
তবুও আমার প্রতিবেশী কেন সন্দেহে তাকায়!
দারিদ্র্যের রেখাগুলি ফুটে ওঠে হাতে ও কপালে!

আমার মায়ের মুখে আঁকিবুঁকি-বড় কষ্টে আছি
তোমার গোলাপ কই সঙ্গী হোক দুঃখের যাত্রায়।

বিছাও পুষ্পের মতো ভালোবাসা

বীরেন সাহা

প্রাঙ্গণে ছড়ানো বন অন্ধকার গহন গভীর
গৃহের আলোয় ভাসে দক্ষিণের ক্ষণিক সময়
সমৃদ্ধির বর্ণময় ভূমি আর
মঞ্জুরিত শান্তির নীড় সারি সারি
নিভৃত হৃদয়ে রেখে এই তীব্র অঙ্গীকার
তোমার প্রসারিত সৃষ্টিময় চোখ
ভারত সন্ধানে যায় ইতিহাস থেকে খুঁজে আনে ত্যাগ
অনন্তের মাঝে বহমান বৈরাগ্যের ছবি
শুভময় শুভ্র এক শাশ্বত স্বদেশ

এই সব মূঢ় ম্লান মুখ
তোমাকে রেখেছে ঘিরে আজো রাখে
দিয়েছো সহাস্য স্থির অবিচল প্রতিজ্ঞার তেজ
হাতে হাত রেখে নৃত্য হোক আর কিছু গান
তাদের দিয়েছ সেই সত্য অভিজ্ঞান

সোনার কাঠিটি খোয়া গেছে যাক
আবার ফসলে ভরে যাবে গোলা
শ্রম দাও আর আসমুদ্র হিমাচলে কচ্ছে মেঘালয়ে
বিছাও পুষ্পের মত ভালোবাসা প্রাচীর ছাড়িয়ে
নিয়েছে এ বাণী
পাহাড়ে অরণ্যে আছে যারা
মাটির কন্যা ভূমিপুত্র সকল সন্তান

তবুও সংশয় ঝড় রেখে যায় ধ্বংসস্তূপ কিছু
থেমে থাকে চাকা তমসার তীরে
পূত রোদে নষ্ট করো বিভ্রমের ক্লেদ
ভালোবাসো যারা আছে মরুভূমে হিমাদ্রির ধারে
ভুলেছে মন্ত্রের ধ্বনি
ঘুমোতে যাবার আগে নাও ফুল সুতো
যেতে হবে প্রাঙ্গণের পারে দূরে
দীর্ঘপথে অরণ্য গভীরে
অখণ্ড ভারত এক সূত্রে একদিন গাঁথা হবে

লাল গোলাপ

শান্তনু দাস

প্রধানের সাদা বুকে তীব্র-লাল পাপড়ি দেখে
আমিও চমকে উঠেছিলাম।
তখন বয়সও অল্প, তবু লাল মানেটার মানে
অল্প বেশী জানা হয়ে গেছে।

তাহলে প্রধানমন্ত্রী কারোবা প্রতীক হ'য়ে ঘুরছেন
এই জেনে তৎকালীন স্থির হ'য়ে আছি।
নীল লাল শাদা বা মেরুণ
তখনও আমার কাছে শুধুমাত্র রঙ ছাড়া
অন্য কিছু নয়
এম্নি আকাটতা এই বয়সেই খানিকটা থাকে।

আলটপকা আমার দেয়ালে তীব্র পোচে
চাপানো কারোর তীব্র রঙ—
লাল।
আমি কিন্তু সে সময়ে অনুভবে তীব্র কাছাকাছি।

আজ এই দুর্ধর্ষ বয়সেও দেখি
দাড়ি কামানোর সময় ব্লেড চল্‌কে
হঠাৎ বেরিয়ে পড়ে—লাল।
তখনই তোমার কথা মনে পড়ে যায় জওহরলাল
এত রঙা ফুল থেকে তুমিও বেছেছো তীব্র লাল।

জওহরলাল ঃ এক অনলস পথিক

উত্থানপদ **বিজলী**

সম্মুখে প্রসারিত যোজন যোজন পথ
প্রগতির পথ, সুখ-ভোগ-সমৃদ্ধিকে অবহেলা ক'রে
হেঁটেছো অনেক তুমি এক অনলস

ভদ্র, সৌম্য, কবি তুমি—তুমি দার্শনিক
তুমি অহঙ্কারী, ভারত-মাতার সন্তান
হাতের শৃঙ্খল তার বেদনাক্ত করেছিল ব'লে
কাঁধে তুলে নিয়েছিলে সে-উত্তরাধিকার

বিদ্ধ হয়েছিলে তুমি ছিন্নমূল মানুষের বেদনার তীরে
কতো প্রাণ ভেসে গেল দাঙ্গা-হাঙ্গামায়
শত্রু-রাষ্ট্রের বীজ পাতা মেলে বামে ও দক্ষিণে
স্বাধীনতার স্বাদ তিক্ত ঃ নীলকণ্ঠ তুমি
রক্তাক্ত ও জর্জরিত,—নিয়ে গুরুভার
হেঁটে গেছো দৃপ্ত পদে মুক্ত কর্ণধার

ওগো বুদ্ধ, যুদ্ধ নয়—ছড়িয়েছ শান্তির বাণী
কি দেব তোমায় আজ ? একমাত্র রক্তিম গোলাপ
যেখানে হৃদয় এসে শতবার কাঙাল হয়েছে।

জওহরলাল

যতীন্দ্রনাথ সরকার

জবাব দিতে শুধুনয় জবাব নিতেও
হয়েছিলে জনতার মিছিলে সামিল

খুলে রেখেছিলে বাহারি পোশাক,
তুলে নিয়েছিলে মোটা খাদি বস্ত্র—

হাতে ধরে হাত
গেয়েছিলে এগিয়ে চলার গান

রাজার সাধ্য কতটুকু ?
থামাতে পারেনি তোমার চলার গতি

তোমার স্বপ্ন, তোমার কথা
অন্তরে চির থাকবে লেখা।

শান্তির অগ্রদূত

পরিতোষ নন্দী

হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা—অসমুদ্র ব্যাপী
ঋজু পায়ে হেঁটে যাওয়া অক্লান্ত মার্জিত পুরুষ
তোমাকে অটুট রাখি শ্রদ্ধাভার নমনীয় বুকের ভেতর
সাদৃশ্য আপাত আছে কী নেই তা মোটামুটি গৌণ
তবে শিশু এবং গোলাপের অন্তরে অদৃশ্য
গেঁথে আছো উচ্ছ্বসিত
পরম পুরুষ তুমি শ্রেণীহীন মানুষের জানি
লড়াকু মেজাজ দেখি
দিয়েছে সমুদ্র পাড়ি ভীত ব্রিটিশ-সিংহ
শান্তির অগ্রদূত তুমি
বলদর্পী হেঁটে গেছো নির্ভীক জগৎ চরাচর
উত্তর-পুরুষে রেখে দিয়ে নিশ্চিত আশ্বাস
পারাপার একদিন শেষ হয়ে গেলে
মাথার ওপর পড়ে থাকে মস্তবড় ছাদ
ছাদের নীচে আমরা প্রজন্ম বালক
হাসি-খুসি প্রাণখোলা উদ্ধত বিনম্র বরাবর
সুতরাং গাছপালা ফুল নদী পাহাড়-জঙ্গল
জগৎ সংসার গহনে তুমি মিশে আছো অমলিন
তোমার জন্য তাই ক্ষণিক নয় সকল মুহূর্ত জাগরণ
তোমারই জন্য হৃদয়ে আমার রইল আসন পাতা

দক্ষ শিল্পী

শক্তিপদ মুখোপাধ্যায়

দক্ষ একজন শিল্পী
যিনি, ভারতবর্ষের বুকের উপর
রঙ-তুলির সূক্ষ্ম টানে
বিখ্যাত সব ছবি এঁকেছিলেন।
অতি আধুনিক, যা সত্যি, সহজে যা কিছু ধরা যায়
সেই সব অসাধারণ ছবিগুলোর
রঙের ব্যবহার দেখতে দেখতে
অন্তর্নিহিত ভাব ও ভাষা বুঝতে বুঝতে
কৈশোরের সবুজ বেড়া টপকে
কখন যেন চলে এসেছি ভর দুপুর বেলায়!

এখন যৎসামান্য উপলব্ধি করতে পারি
বীর শিল্পীর আঁকা এক-একটি ছবির গৌরব
গোটা ভারতবর্ষের ঘরে এবং বাইরে
যেখানেই দুচোখ রাখি না কেন
উজ্জ্বল হয়ে ওঠেন তিনি ও তাঁর সাধের ভারতবর্ষ ।।

বর্ণময় গোলাপ

বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য

কোন সাদা ফুল নয় আজ
রক্ত চন্দন দিয়ে তোমাকে স্মরণ করবো
নির্ভাঁজ পাপড়ি রক্ত গোলাপও থাকবে
শিশুদের সরল হাসি হবে উপাচার।

জাতীয় পতাকা দিয়ে চোখ বেঁধে
আজকাল কানামাছি খেলাও নাকি হচ্ছে ?
রঙিন পানীয় সহযোগে জলযোগ !
আমি অবশ্য তাদের ঘৃণা করি না
স্বপ্নের ফানুস তিন পাক খেয়ে
সশব্দে আছড়ে পড়ে ভোজ সভায়।
ফেনা তোলা পানীয় খানিকটাচলকে
চেয়ারে বসার জায়গাটা পিচ্ছিল করে,
শস্য শ্যামলা ভারতবর্ষের হৃৎপিণ্ডে
কারা যেন একটা ধারালো ছুরি বসিয়ে
খাবার টেবিলে আপেল দু' টুকরো করে
তোলে তৃপ্তির ঢেকুর।
অনেকগুলো চেয়ার ঘিরে কানামাছি খেলাটা
খুব জমবে। ক্যালেণ্ডারের তারিখ দিয়ে
সংখ্যাগুলো শেষ হবে না— আসমুদ্র
হিমাচল দিন গুনবে আর ভাববে
'এক পয়সা সের নুন বুঝি হ'ল বলে' !
নিষ্পাপ কুঁড়িগুলো তোমায় শান্তি পেতে
সাহায্য করেছিল কয়েকটি মুহূর্ত
আশা হতাশা ভালবাসায়
একশো বছর পরেও কী জন্মাবে না কোন
বর্ণময় গোলাপ !

তোমারও প্রাণ আছে

ধ্রুবজ্যোতি মণ্ডল

বেয়নেট আজও রক্তের পিপাসায় মত্ত
লেফাফায় ঘাপটি মেরে পিস্তল এখনো সুযোগ খোঁজে
তোমার মুক্ত করা ভূমিতে জন-অরণ্য এখন
বড় বেশি উদ্দাম ও উদোম
স্নেহময় তোমার শাবকদের জিভে
ড্রাগ আর হেরোইনের তাঁবু পড়ে গেল
কেন ?
সূর্যের চারপাশে পৃথিবী তো সেই চলেছে পা-পা
মোরগের ডাকে যেমনটি আসে ভোর
থামা নেই
তেমন   আনে রাত
তোমারও প্রাণ আছে সমাজ দর্পণে।

নিদ্রাহীন মানুষের জন্য

অমিতেশ মাইতি

আসলে এমন সুখ কখনো আসেনি,
লালবেল্লার শিখর ছুঁয়ে স্বাধীন হাওয়াগুলি যেদিন কোলাহল
করতে করতে গেল

সেই মুহূর্তে পুনর্জন্ম হোল আমার,
হাত থেকে দানা খুঁটে খেল দিব্য কবুতর
বাঁজা গোলাপের গাছ তার রক্ত চিংড়ে ফোটাল কুসুম।
ভাল থেকো ভালবাসা
এই দেশ ও মাটির স্বপ্নে আমাদের সুখে কার যেন কষাঘাত,
কার যেন অস্ত্র
এঁকে গেছে ক্ষত।

স্বাধীনতা, তোমার চুলের মুঠি ধরে নয় আর,
চন্দন প্রলেপ সেই হা হা ব্যথায় দাও শান্তি—
এডুইনার হাসির মতো ছড়িয়ে থাকো
লক্ষ মানুষের ঠোঁটে, পথ রাখো স্পষ্ট
কেননা একটি মানুষ হেঁটে যাবে
তার দীর্ঘযাত্রার কোন অবসান নেই, নেই শেষ রেখা।
কোটের পকেটে কবিতার বই নিয়ে
এখনো একটি মানুষ বিমর্ষ নিদ্রাহীন।

কবি-পরিচিতি

রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১—১৯৪১): একমাত্র নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ভারতীয় সাহিত্যিক। জওহরলাল নেহরু তাঁর জীবন-দর্শনের দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হয়েছিলেন। বোম্বাইয়ের ব্র্যাবোর্ন স্টেডিয়ামে আয়োজিত রবীন্দ্র জন্ম-শতবার্ষিকীর সূচনা করতে গিয়ে জওহরলাল বলেছিলেন: কর্মসূত্রে যদিও আমি গান্ধীজীর কাছে-বাঁধা, কিন্তু চিন্তাসূত্রে আমি রবীন্দ্রনাথের-ই।

কুমুদরঞ্জন মল্লিক (১৮৮৩-১৯৭০): জন্ম অজয় নদীর তীরে কোগ্রামে। আজীবন শিক্ষাব্রতী ছিলেন। তাঁর প্রধান খ্যাতি ছিলো পল্লীকবি হিসেবে। প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে-'উজানী', 'নূপুর', 'বনতুলসী', 'স্বর্ণসন্ধ্যা' বিশেষ উল্লেখ্য।

নরেন্দ্র দেব (১৮৮৮-১৯৭৫): প্রখ্যাত শিশু-সাহিত্যিক। বড়দের জন্যও লিখছেন গল্প-উপন্যাস। 'ওমর খৈয়াম' ও 'মেঘদূত' এর অনুবাদ স্মরণীয় সাহিত্য-কীর্তি। ছোটদের পত্রিকা 'পাঠশালা' সম্পাদনা করেছেন দীর্ঘদিন। উল্লেখ্য গ্রন্থ—'আনন্দধারা' ও 'অনেক দিনের কথা'।

কালিদাস রায় (১৮৮৯-১৯৭৫): বিশিষ্ট কবি ও প্রাবন্ধিক। আজীবন শিক্ষাব্রতী। 'কবিশেখর' উপাধিতে ভূষিত। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে 'পর্ণপুট', 'ঋতুমঙ্গল', 'রসকদম্ব', 'বঙ্গসাহিত্য পরিচয়' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৬৫): পৈতৃক নিবাস নদীয়ার লোকনাথপুর। দেশাত্মবোধক কবিতা রচনায় খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। 'পল্লীব্যথা', 'অনুরাধা', 'রক্তরেখা', 'চিত্তরঞ্জন' প্রভৃতি তাঁর উল্লেখ্য গ্রন্থ। বিভিন্ন সময়ে 'বিজলী', 'অভ্যুদয়', 'উপাসনা' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। কলকাতার জাতীয় মহাবিদ্যালয়ে বাংলাভাষার অধ্যাপনা করেন।

বনফুল (বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়) (১৮৯৯-১৯৭৯): জন্ম বিহারের পূর্ণিয়া জেলায়। স্কুলে পড়ার সময়েই তাঁর প্রথম কবিতা 'মালঞ্চ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রায়-শতাধিক গ্রন্থের লেখক। উল্লেখযোগ্য

রচনা—'স্থাবর', 'জঙ্গম', 'হাটে-বাজারে', 'ভীমপলশ্রী' প্রভৃতি। 'রবীন্দ্র পুরস্কার' ও অন্যান্য পুরস্কারে সম্মানিত।

অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১-১৯৮৬): জন্ম শ্রীরামপুরে। প্রখ্যাত কবি ও প্রাবন্ধিক। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক সহকারী হিসাবে কাজ করেছেন বেশ কিছুদিন। 'সাহিত্য আকাদমি', 'পদ্মভূষণ', বিশ্বভারতীর 'দেশিকোত্তম' প্রভৃতি সম্মানে সম্মানিত। ইংরেজি ও বাংলায় বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন।

মনীশ ঘটক (১৯০২-১৯৭৯): কল্লোল যুগের খ্যাতনামা সাহিত্যিক। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'শিলালিপি'। 'যুবনাশ্ব' ছদ্মনামে তিনি গল্প ও গদ্য রচনা করেছেন। 'পটলডাঙার পাঁচালী', 'কনখল', 'মান্ধাতার বাবার আমল' ইত্যাদি তাঁর উল্লেখ্য গল্প-উপন্যাস ও জীবনীমূলক গ্রন্থ। 'যদিও সন্ধ্যা', 'বিদূষী বাক' আঁর কাব্যগ্রন্থের মধ্যে বিশেষ পরিচিত।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-১৯৭৬): কল্লোল যুগের অন্যতম প্রতিনিধি। উপন্যাস রচনায় তিনি বাংলা সাহিত্যে নতুন মাত্রা সংযোগ করেন। কাব্য সাহিত্যেও তাঁর অবদান উল্লেখ্য। 'উত্তরায়ণ' কাব্যগ্রন্থের জন্য 'রবীন্দ্র পুরস্কারে' সম্মানিত হয়েছেন। 'কল্লোল যুগ', 'বিবেকানন্দ', 'পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ', 'দুই ভাই', 'ঝড়ের যাত্রী' প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

অন্নদাশঙ্কর রায় (১৯০৪): বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক, কথাশিল্পী ও ছড়াকার। ওড়িয়া ভাষায় প্রথম সাহিত্য রচনা। পরে বাংলা ভাষায়-সাহিত্য চর্চা শুরু করেন। 'সবুজপত্র' গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আই. সি. এস. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার কারছিলেন। ইংরেজি ও বাংলায়-অসংখ্য গ্রন্থ-রচনা করেছেন উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'পথে প্রবাসে', 'সত্যাসত্য', 'জীয়নকাঠি', 'উড়কি ধানের মুড়কি', 'রাঙা ধানের খই', 'গান্ধী' ইত্যাদি। 'সাহিত্য আকাদমি পুরস্কার' ও বিশ্বভারতীর 'দেশিকোত্তম' সম্মানে সম্মানিত।

প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪—১৯৮৮): কল্লোল যুগে অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। কবি, কথা সাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক, শিশুসাহিত্যিক হিসেবে অসামান্য খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। চলচ্চিত্র জগতেও তাঁর অবদান উল্লেখ্য। 'কালি-কলম' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তাঁর গ্রন্থের মধ্যে 'পাঁক', 'বেনামী বন্দর', 'পুতুল ও প্রতিমা', 'মহানগর', 'সূর্য কাঁদলে সোনা', পিঁপড়ে পুরাণ', ঘনাদার গল্প', 'প্রথমা', 'সম্রাট', 'সাগর থেকে ফেরা', হরিণ-চিতা-চিল' প্রভৃতি উল্লেখ্য, 'সাহিত্য আকাদমি', ও 'রবীন্দ্র পুরস্কারে'

সম্মানিত। 'পদ্মশ্রী' ও বিশ্বভারতী'র 'দেশিকোত্তম' সম্মান অর্জন করেছেন।

হুমায়ুন কবীর (১৯০৬-১৯৬৯): বর্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুরে জন্ম। কৃতী ছাত্র হিসাবে বহু পদক ও পুরস্কার পেয়েছিলেন। এশিয়াবাসীর মধ্যে তিনিই প্রথম অক্সফোর্ডের মডার্ন গ্রেটস্ পরীক্ষায় প্রথম হন। জওহরলাল নেহরুর মন্ত্রিসভায় শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী ছিলেন। কবি ও প্রাবন্ধিক। প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে 'স্বপ্নসাধ', 'সাথী', 'অষ্টাদশী', 'বাংলার কাব্য', 'Bengali Novel' প্রভৃতি উল্লেখ্য। 'চতুরঙ্গ' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য (১৯০৯-১৯৬৯): ত্রিপুরার শ্যামগ্রামে তাঁর জন্ম। কবি, ঔপন্যাসিক এবং প্রাবন্ধিক হিসেবে বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবদান অপরিসীম। দীর্ঘদিন 'পূর্বাশা' সাহিত্য পত্রিকাটি সম্পাদনা করেছিলেন। 'পূর্বাশা'র মাধ্যমে তিনি বাংলা সাহিত্যে একটা নতুন আন্দোলন সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিলেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'বৃত্ত', 'মরামাটি', 'দিনান্ত', 'ঋণ', 'তিনজন আধুনিক কবি', 'প্রাচীন প্রাচী' এবং History of Mohenjo-Doro। সাংবাদিক হিসেবেও খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

উমাশঙ্কর যোশি (১৯১১-১৯৮৯): প্রখ্যাত গুজরাটি কবি ও প্রাবন্ধিক। প্রথম কবিতার বই 'বিশ্বশান্তি' প্রকাশিত হয় ১৯৩১ সালে। জ্ঞানপীঠ ও আকাদমি পুরস্কার বিজয়ী লেখকের উল্লেখ্য গ্রন্থ হলো 'গঙ্গোত্রী', 'নিশীথ', 'বসন্ত-বর্ষ', এবং 'অভিজ্ঞা'। 'সংস্কৃতি' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। 'সাহিত্য আকাদমি'র প্রাক্তন সভাপতি শ্রী যোশী আমেদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য এবং কিছুকাল রাজ্যসভায় কংগ্রেস সদস্য ছিলেন।

বন্দে আলী মিঞা (১৯০৬-১৯৭৯): জন্ম বর্তমান বাংলাদেশের রাজশাহীতে। প্রায় দুই শতাধিক গল্প ও কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা। শিশু সাহিত্যে তাঁর অবদান উল্লেখ্য। 'আকাশবাণী'র সঙ্গে বহুকাল যুক্ত ছিলেন।

দক্ষিণারঞ্জন বসু (১৯১২-১৯৮৯): বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকা জেলার বজ্রযোগিনী গ্রামে জন্ম। যুগান্তর পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক।

বিশিষ্ট কবি, প্রাবন্ধিক ও কথাশিল্পী। 'আরও সূর্যের কাছে', 'অলক্ষ্যে বিকেল', 'আশা যখন বৃষ্টি', 'রাত্রিকে দিনকে' তাঁর কয়েকটি উল্লেখ্য গ্রন্থ।

দিনেশ দাস (১৯১৩-১৯৮৫): বিশিষ্ট কবি ও প্রাবন্ধিক। আজীবন শিক্ষাব্রতী। 'রবীন্দ্র পুরস্কার' এবং আরো সম্মানে সম্মানিত। প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে 'কবিতা', 'ভুখ-মিছিল,' 'অহল্যা', 'কাঁচের মানুষ' বিশেষ উল্লেখ্য।

দেবকান্ত বড়ুয়া (১৯১৪): রাজনীতিবিদ্ হিসেবে বেশী খ্যাত হলেও অসমীয়া আধুনিক কাব্য আন্দোলনের সূচনা পর্বে গভীর প্রভাব ফেলেছিলেন। 'সাগর দেখিছা' তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ।

সুশীল রায় (১৯১৫-১৯৮২): বিশিষ্ট কবি, কথা সাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক। 'ধ্রুপদী' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। প্রতি ঘণ্টার কবিতা পত্রিকা 'কবিতা ঘণ্টিকী' সম্পাদনা করেছিলেন। এছাড়া ছিলেন 'বিশ্বভারতী' পত্রিকার সম্পাদক। প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে 'সুচরিতাষু', 'পাঞ্চালী', 'প্রণয়ী পঞ্চক' প্রভৃতি উল্লেখ্য। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং আধুনিক কবিতা সম্পর্কিত গ্রন্থ দুটি বাংলা সাহিত্যের সম্পদ।

হরপ্রসাদ মিত্র (১৯১৭): কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন রবীন্দ্র অধ্যাপক। বিশিষ্ট কবি ও প্রাবন্ধিক। সোভিয়েত ল্যাণ্ড পুরস্কার ও আরো সম্মানে সম্মানিত। প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে 'ভ্রমণ', 'পৌত্তলিক', 'চন্দ্রমল্লিকা' এবং 'সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবি-মানস' উল্লেখযোগ্য।

অমৃতা প্রীতম (১৯১৯): পাঞ্জাবী ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক। 'জ্ঞানপীঠ', 'সাহিত্য আকাদমি' ও বহু সম্মানে সম্মানিত। প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে 'অমৃত লহরে', লম্পিয়া ওয়াতন', 'আজ অখন ওয়ারিশ শাহু' 'ডাঃ দেব' প্রভৃতি উল্লেখ্য। বর্তমান রাজ্যসভার কংগ্রেস সদস্য।

বাণী রায় (১৯১৯): বিশিষ্ট কবি, কথা-সাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক। কিছুকাল ইংরেজি সাহিত্যে অধ্যাপনা করেছেন। প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে 'জুপিটার', 'চক্ষে আমার তৃষ্ণা', 'পৃথিবী পরিক্রমা' বিশেষ উল্লেখ্য।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯১৯): সমকালীন বাংলা সাহিত্যে একটি স্মরণীয় নাম। কবিতা ছাড়াও গল্প, উপন্যাস এবং প্রবন্ধ সাহিত্যে তাঁর অবদান উল্লেখ্য। 'পরিচয়' পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন কিছুকাল। আফ্রো-এশীয় লেখক সঙ্ঘের সেক্রেটারী জেনারেল হিসেবে পৃথিবীর বহুদেশ ভ্রমণ

করেছেন। মধ্যপ্রদেশের ভারত-ভবনের কবীর পুরস্কার ও সাহিত্য আকাদমি পুরস্কারে সম্মানিত। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'পদাতিক', 'অগ্নিকোণ' 'চিত্রকূট', 'যতদূরেই যাই', 'কাল মধুমাস', 'ছেলে গেছে বনে', 'হাংগ্রাস' ইত্যাদি। সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে যুগ্মভাবে 'সন্দেশ' পত্রিকাটিও কিছুকাল সম্পাদনা করেছেন। অনুবাদক হিসেবেও তাঁর প্রতিভা ঈর্ষনীয়।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (১৯২৪): জন্ম বর্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুরে। সমকালীন বাংলা কাব্য জগতে নেতৃস্থানীয়। কিশোর পত্রিকা 'আনন্দ মেলা'র প্রাক্তন সম্পাদক। তাঁর রচিত 'নীল নির্জন', 'নীরক্ত করবী', 'উলঙ্গ রাজা', 'কবিতার ক্লাশ', 'কলকাতার যীশু', 'শাদা বাঘ' প্রভৃতি উল্লেখ্য। কয়েকটি উপন্যাসও রচনা করেছেন। 'সাহিত্য আকাদমি' পুরস্কারে সম্মানিত।

জগন্নাথ চক্রবর্তী (১৯২৪): বিশিষ্ট কবি, প্রাবন্ধিক এবং অনুবাদক। প্রথম আধুনিক মহাকাব্য 'মহাদিগন্ত' রচনা করে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। ইণ্ডিয়ান রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'নগর সন্ধ্যা', 'কলকাতা কলকাতা কলকাতা', 'পার্ক স্ট্রিটের স্ট্যাচু', 'রাজকোট রাজপথ রাজঘাট', Revenge in Shakespearean Tragedy ইত্যাদি। ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব এডুকেশন-এর উদ্যোগে যে অভিধান প্রকাশিত হতে চলেছে, শ্রী চক্রবর্তী তার প্রধান সম্পাদক।

অমিতাভ চৌধুরী (১৯২৮): আসামের শিলচরে জন্ম। 'যুগান্তর' পত্রিকার বর্তমানে যুগ্ম সম্পাদক। ছড়া ও গান রচনায় অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। রবীন্দ্র বিষয়ক অনেক গ্রন্থ রচনা করে তিনি মৌলিক প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর অসংখ্য গ্রন্থের মধ্যে মাত্র কয়েকটি : 'তেপান্তরের মাঠে', 'অচেনা শহর কলকাতা', 'যবনিকা কম্পমান', 'জমিদার রবীন্দ্রনাথ' ইত্যাদি।

রঘুবীর সহায় (১৯২৯): আধুনিক হিন্দী সাহিত্যের বিশিষ্ট কবি, প্রাবন্ধিক ও সাংবাদিক। 'আকাদমি পুরস্কার' বিজয়ী।

অরুণ বাগচী (১৯২৯): বিশিষ্ট কবি, প্রাবন্ধিক ও সাংবাদিক। ভ্রমণ করেছেন বিভিন্ন দেশ। 'আনন্দবাজার' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক।

সুনীল বসু (১৯৩০): বর্তমান বাংলাদেশের যশোহর জেলায় জন্ম। পেশা সাংবাদিকতা। প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে 'সিন্ধু সারস', 'তিমির তরঙ্গ'

ও 'হৃৎপিন্ডে দারুণ দামামা' উল্লেখ্য। কিছুকাল 'অধুনা' পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন।

গৌরাঙ্গ ভৌমিক (১৯৩০): বিশিষ্ট কবি ও প্রাবন্ধিক। পেশা: সাংবাদিকতা। তাঁর গ্রন্থগুলির মধ্যে 'বৃষ্টিপাত', নিজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ', 'অশুভ সঙ্গীত', 'ঘুড়ি ও মেঘের লুকোচুরি', বিশেষ উল্লেখ্য। কয়েকটি প্রবন্ধ গ্রন্থও রচনা করেছেন। কিছুকাল 'অনুভব' এবং 'সাহিত্য চর্চা' নামের দুটি পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন।

রমেন দাস (১৯৩০): শিশু সাহিত্য দিয়ে লেখক জীবনের শুরু। 'সবুজ সাথী' ছদ্মনামেও লিখেছেন। কিশোর মাসিকে 'রোশনাই'-এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। বর্তমানে 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ' পত্রিকার কলকাতার চিফ অব নিউজ ব্যুরো। উল্লেখ্য গ্রন্থ: 'জয় সূর্য', 'স্বর্গ বিজয়', 'রক্তমায়ার দ্বীপ', 'ইতিহাসের কলকাতা', 'ঘরে বাইরে নজরুল' ইত্যাদি।

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় (১৯৩১): বিশিষ্ট কবি। গল্প, উপন্যাস রচনাতেও সিদ্ধহস্ত। শিশু-সাহিত্য রচনাতেও পারদর্শী। প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে 'সোনার হরিণ', 'আহত ভ্রু-বিলাস', 'কোথায় সেই দীর্ঘ চোখ' প্রভৃতি উল্লেখ্য। র‍্যাঁবোর কবিতা অনুবাদে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। 'কথা ছিলো' এবং 'সাবাস' তাঁর রচিত উপন্যাস।

কবিতা সিংহ (১৯৩১): বিশিষ্ট কবি, গল্পকার ও প্রাবন্ধিক। আকাশবাণীর উচ্চপদে কর্মরতা। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'সহজ সুন্দরী', 'কবিতা পরমেশ্বরী', 'হরিণা বৈরী', 'চারজন রাগী যুবতী', 'পাপ-পুণ্য পেরিয়ে', ইত্যাদি।

সুবোধ দাশগুপ্ত (১৯৩১): জন্ম কলকাতায়। মূলতঃ শিল্পী হলেও কবিতা, গল্প ও ছোটদের জন্য লেখায় যথেষ্ট মুন্সিয়ানায় পরিচয় রেখেছেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে কাজ করেছেন। বর্তমানে 'যুগান্তর' ও 'অমৃতবাজার' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। আঁকায় ফাইন আর্টস এর প্রভাব আছে। এবং আঁকার সমস্ত শাখাতেই অবাধ যাতায়াত। মার্গ সঙ্গীতের অনুরাগী। প্রথম প্রচ্ছদ: বিমল করের ছোটগল্প সংকলন কাঁচঘর।

শঙ্করানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯৩২): কবি ও প্রাবন্ধিক। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চপদে কর্মরত। ইংরেজি ও বাংলায় কয়েকটি উল্লেখ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন।

সলিল লাহিড়ী (১৯৩২): বর্তমান বাংলাদেশের পাবনা জেলায় জন্ম। পেশায় বাস্তুকার। শিশু সাহিত্য রচনায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন ; পুরস্কৃত হয়েছেন 'শিশু সাহিত্য সম্মেলন' থেকে। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'পরিবেশ ভাবনা', 'রোবট ২১০০', 'কাশ্মীরের ঝঙ্কার', 'ছোটদের মজাদার গল্প' ইত্যাদি।

আলোক সরকার (১৯৩২): বিশিষ্ট কবি ও প্রাবন্ধিক। পেশা : অধ্যাপন। কাব্য নাটক রচনাতেও সিদ্ধহস্ত। 'শতভিষা' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক এবং একটি কাব্য আন্দোলন সৃষ্টি করেছেন পত্রিকাটির মাধ্যমে। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'উতল নির্জন', 'আলোকিত সমন্বয়', 'বিশুদ্ধ অরণ্য', 'প্রবাহমান সাহিত্য', ইত্যাদি।

আনন্দ বাগচী (১৯৩৩): বর্তমান বাংলাদেশের পাবনা জেলায় জন্ম। কবি, প্রাবন্ধিক এবং কথা সাহিত্যিক। কিছুকাল অধ্যাপনা করে-ছিলেন। বর্তমানে 'দেশ' পত্রিকার সহ-সম্পাদক। প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে 'স্বগত সন্ধ্যা', 'তেপান্তর', 'স্বকালপুরুষ', উজ্জ্বল ছুরির নিচে' ইত্যাদি উল্লেখ্য। বিভিন্ন সময়ে 'সেতু', 'কৃত্তিবাস' ও 'পারাবত' পত্রিকার সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত (১৯৩৩): প্রখ্যাত কবি, প্রাবন্ধিক ও অনুবাদক। বর্তমানে পশ্চিম জার্মানীর হাইডেলবার্গে অধ্যাপনায় নিযুক্ত। প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে 'যৌবন বাউল', 'নিষিদ্ধ কোজাগরী', 'রক্তাক্ত ঝরোকা', 'এবার চলো বিপ্রতীপে', 'ছৌ-কাবুকির মুখোশ' ইত্যাদি উল্লেখ্য।

অর্ধেন্দু চক্রবর্তী (১৯৩৫): জন্ম ব্রহ্মদেশের রেঙ্গুনে। লেখাপড়া করেছেন এলাহাবাদে। কবি, প্রাবন্ধিক ও অনুবাদক। প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে 'অরণ্য দিন বদলাচ্ছে', 'একলা পুরুষ', 'ঝাপসা ফুল গাছপালা', 'প্রসঙ্গ অর্জুন', 'প্রেম অপ্রেম', 'সময় ও ব্যক্তিগত গদ্য', 'ইভান তুর্গেনিভ' প্রভৃতি উল্লেখ্য। 'আবর্ত' পত্রিকার প্রধান সম্পাদক।

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত (১৯৩৬): বিশিষ্ট কবি, প্রাবন্ধিক ও শিল্প সমালোচক। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের রিডার। ছোটদের জন্যও অনেক লিখেছেন। প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে 'এক ঋতু', 'সদর স্ট্রিটের বারান্দা', 'নিজস্ব ঘুড়ির প্রতি', 'শুধু বিচ্ছিন্নতা নয়' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

বাসুদেব দেব (১৯৩৬) : বর্তমান বাংলাদেশের বরিশালে জন্ম। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী। কবি ও প্রাবন্ধিক। উল্লেখ্য গ্রন্থ : 'একটা গুলির শব্দ', 'রৌদ্রের ভেতরে চিঠি', 'দেখা দাও প্রতিদিন', ইত্যাদি।

বিজয়া মুখোপাধ্যায় (১৯৩৭) : জন্ম বর্তমান বাংলাদেশের বিক্রমপুরে। পেশা : লেখাপড়া। উল্লেখ্য গ্রন্থ : 'আমার প্রভুর জন্য', 'ভেঙে যায় অনন্ত বাদাম', ' উড়ন্ত নামাবলী' ইত্যাদি।

আশিস সান্যাল (১৯৩৮) : কবি, প্রাবন্ধিক ও কথা সাহিত্য। ইন্ডিয়ান রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক। ইংরেজি ও বাংলায় ৩৫টি গ্রন্থ এখন পর্যন্ত রচনা করেছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে 'শেষ অন্ধকার প্রথম আলো', 'মৃত্যুদিন জন্মদিন', 'আজ বসন্ত', 'পটভূমি কম্পমান', 'এখন তথাগত', 'ভোরের বৃষ্টি', প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য 'Contribution of Bengali Writers to National Freedom Movement' বিশেষ উল্লেখ্য। 'কলাভারতী' পুরস্কারে সম্মানিত।

সজল ভট্টাচার্য (১৯৩৯) : বর্তমান বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলায় জন্ম। কবি ও প্রাবন্ধিক। প্রকাশিত গ্রন্থ : 'শূন্য পদতল', 'সাগরে যাবো না', 'সাপ ও বেদে' ইত্যাদি। বি. বি. সি এবং ভয়েস অব্ আমেরিকার অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেছেন।

দেবী রায় (১৯৪০) : বিশিষ্ট কবি, প্রাবন্ধিক ও অনুবাদক। এক সময়ে হাংরি আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে 'কলকাতা ও আমি', 'মানুষ মানুষ', 'ভ্রূকুটির বিরুদ্ধে একা' 'উন্মাদ শহর' 'এই সেই তোমার দেশ' 'পুতুল নাচের গান', উল্লেখ্য। 'উত্তর প্রবাসী' পুরস্কারে সম্মানিত।

সজল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৪২) : কবি, প্রাবন্ধিক ও অনুবাদক। পেশা শিক্ষকতা। কয়েকটি উল্লেখ্য গ্রন্থ : 'তৃষ্ণা আমার তরী', 'স্বপ্নে উপকূলে', 'পিকাসোর নীল জামা', 'ব্রায়ার পাইপ,' 'ভ্রমণ' ইত্যাদি। বাইবেলের অনুবাদ একটি স্মরণীয় কীর্তি।

মঞ্জুষ দাশগুপ্ত (১৯৪২) : অর্থনীতিতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অঞ্চল প্রকল্পক। উল্লেখ্য গ্রন্থ : 'একদিন একরাত', 'প্রথম দিনের সূর্য' ইত্যাদি।

বীরেন সাহা (১৯৪২) : জন্ম ঢাকার বিক্রমপুরে। কবি, প্রাবন্ধিক ও গল্পকার। কিছুদিন অধ্যাপনা করেছেন। বর্তমানে কলকাতা দূরদর্শনের বার্তা সম্পাদক। প্রকাশিত গ্রন্থ 'ইচ্ছাগঞ্জের মোড়ে', 'অপসৃত জলছবি'। অনুবাদ ছোটদের রামায়ণ।

শান্তনু দাস (১৯৪২) : বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকায় জন্ম। বিশিষ্ট কবি ও কথা সাহিত্যিক। পেশা সরকারী চাকুরী। উল্লেখ্য গ্রন্থ : 'দীর্ঘশ্বাস মঞ্চে স্মৃতিময়', মধ্যাহ্নে ব্যাধ', 'বর্মের আড়ালে একা' ইত্যাদি। কয়েকটি অসামান্য সংকলন গ্রন্থের সম্পাদক।

উত্থানপদ বিজলী (১৯৪৪) : কবি ও প্রাবন্ধিক। 'কবিতা আভাস' পত্রিকার সম্পাদক। উল্লেখ্য গ্রন্থ : 'গোচারণে প্রতিদিন' 'অভাবিত খরার ভেতরে', 'এক বসন্ত'। সম্পাদিত গ্রন্থ : কবিতা ; দশক আশি।

যতীন্দ্রনাথ সরকার (১৯৫৪) : 'আবর্ত' পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদিত। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত লিখে থাকেন। ফটোগ্রাফির ওপর বিশেষ ঝোঁক আছে।

পরিতোষ নন্দী (১৯৫৫—১৯৮৯) : কবিও প্রাবন্ধিক। বর্তমান সংকলনে প্রকাশিত কবিতাটিই তাঁর সর্বশেষ রচনা। প্রকাশিত গ্রন্থ : চালচিত্র'। ছোট গল্পের জন্য পুরস্কারও পেয়েছেন। তাঁর অকাল প্রয়াণ বাংলার বুকে সবিশেষ ক্ষতি।

শক্তিপদ মুখোপাধ্যায় (১৯৫৬) : বর্তমান বাংলাদেশের যশোহর জেলায় জন্ম। প্রধানতঃ কবি হলেও গল্প ও ভ্রমণ কাহিনী লিখে থাকেন। ফাইন আর্টসের উপর বিশেষ ঝোঁক আছে। আনন্দবাজার পত্রিকায় কর্মরত।

বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য (১৯৬০) : সালে মেদিনীপুরের এক অজ পাড়া-গাঁয়ে জন্ম। কৈশোর কেটেছে নিদ্রাতুর প্রকৃতির কোলে। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পড়াশুনা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। মূলতঃ কবি হলেও গল্প ও ছোটদের জন্য লেখাও লিখে থাকেন। অধুনালুপ্ত 'ঝলমল' পত্রিকায় লেখার হাতে খড়ি, 'বইয়ের কাগজ' পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক। বর্তমানে একটি প্রকাশন সংস্থার সঙ্গে যুক্ত। প্রকাশিত কাব্য গ্রন্থ 'জীবন অনেক, অনেক দূর'।

ধ্রুবজ্যোতি মণ্ডল (১৯৬১) : কবি ও প্রাবন্ধিক। পেশায় সাংবাদিক।

অমিতেশ মাইতি (১৯৬৩) : জন্ম মেদিনীপুরের পাঁশকুড়ায়। স্নাতকোত্তর পড়াশুনা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। বাক প্রতিম পত্রিকার সম্পাদক। কবিতা ছাড়াও গল্প প্রবন্ধ লিখে থাকেন। প্রকাশিত গ্রন্থ : কবিতা পাঠকের জার্নাল।